জ্ঞান-ভারতী
গ্রন্থমালা
বাংলার
কুটীর-শিল্প
১
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

বাংলার
কুটীর-শিল্প
শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্ত্তী
আশুতোষ লাইব্রেরী
কলিকাতা - ঢাকা

—প্রকাশক—
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী : **আশুতোষ লাইব্রেরী**
৫, বংকিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের
জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত

চতুর্থ সংস্করণ
১৩৬২

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বংকিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য দশ আনা

নিবেদন

দেশের ভবিষ্যতের জন্য যিনি ভেবেছেন, সমস্তটা জীবন যিনি দেশের কাজেই উৎসর্গ করেছেন—সেই ঋষিকল্প আচার্য্যের পদপ্রান্তে ব'সে একথা আমি শুনেছি যে, দেশের উল্টো-গতির মোড় ফিরাতে হলে ছোটদের দিয়েই তা আরম্ভ করতে হবে। "ছেলেরা বই মুখস্থ ক'রে ভালভাবে পাশ ক'রে বড় কেরাণী হয়, কিন্তু মানুষ হয় না। এইজন্য দেখা গেছে দুই-তিনটে পাশ ক'রেও কোন কোন বিদ্বান আউস ধান আর আমন ধানের পার্থক্য বোঝে না, কোন্ কাঠের কি গুণ, কোন্ জিনিষ কোথায় জন্মে, কোন্ শিল্প কোথায় গ'ড়ে উঠেছে এসব খবর তারা বড় একটা রাখে না।"

ছোট ছেলেদের দৃষ্টি এদিকে ফিরাতে হলে গল্পের ভিতর দিয়ে তাদের নিজের ঘরবাড়ী, গাছ-পালা ও তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যে সব জিনিসের পরিচয় হচ্ছে, সে সম্বন্ধে একটা সহজ জ্ঞান দিতে হবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই জ্ঞান-ভারতী গ্রন্থমালার 'বাংলার কুটীর-শিল্প' প্রকাশিত হ'ল। মৃৎ-শিল্প, দারু-শিল্প, কারু-শিল্প, রঞ্জন-শিল্প, আসন-শিল্প, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে 'বাংলার শিল্প-সম্পদ' গ্রন্থে। সেটিও এই গ্রন্থমালারই অন্তর্গত।

কুটীর-শিল্পের প্রবন্ধগুলোর কিছু কিছু কৈশোরিকা, শিশুসাথী, রামধনু, মৌচাক ও মাসপয়লা প্রভৃতি মাসিকে প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞান-ভারতী গ্রন্থমালায় সেগুলোর কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ক'রে লিখিত হয়েছে।

বাংলার শিল্প-কথা সম্বন্ধে এই ভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন নদীয়ার মহারাজকুমার শ্রীমান্ সৌরীশচন্দ্র রায়, শিশুসাথীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর, রামধনুর সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও স্বনামধন্য শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। এই গ্রন্থমালা

বাংলার ছেলেদের যদি সত্যিই কিছু উপকার করতে পারে তবে সেজন্য প্রশংসা পাবেন এঁরাই।

লেখক কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ থাকবে—সকলের চেয়ে গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন যিনি—আশুতোষ লাইব্রেরীর সেই সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিশরণবাবুর কাছে। দেশের ছেলেদের ঝোঁক যখন উদ্ভট রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ কাহিনীর উপর, তখন এই ধরণের বই তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সৎসাহস খুব কম প্রকাশকেরই আছে ব'লে আমি মনে করি।

বি. পি. টেকনিক্যাল স্কুল
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আশীর্বাণী

University College of Science and Technology
92, Upper Circular Road, Calcutta
Phone Regent, 159 Department of Chemistry
3. 6. 40

কল্যাণবরেষু

খুলনা জেলায় দেড়মাস নৌকাভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তোমার পত্র পাইলাম।

তুমি শিশু-সাহিত্যে শিল্পকথা সম্বন্ধে লিখিয়া আসিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আমার বয়স এখন 'চার কুড়ি' হইতে চলিল—কমপক্ষে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি বাঙ্গালী যুবকের দৃষ্টি এই দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি—কতটুকু ফল তাহাতে ফলিয়াছে ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে।

তোমার উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হউক। ইতি

শুভার্থী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

'Let every house-holder sit to work with his own hand and thus make every house a big industrial farm.'

—*M. K. Gandhi*

'প্রত্যেক গৃহস্থ তার নিজের হাতে কাজ করতে বসুক—তা হলে প্রত্যেক গৃহই এক একটা বড় শিল্পাগারে পরিণত হইবে।'

—মহাত্মা গান্ধী

ঘরছাড়া বাঙ্গালী

"এখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশিষ্টের যে কত সম্পদ রয়েছে তাকে চিনবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই।"—গুরুসদয় দত্ত

সেদিন ব্যারাকপুর ষ্টেশনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমাদের লাফাজদ্দি পগারপারের সঙ্গে।

লাফাজদ্দি আমাদের বাল্যবন্ধু এবং ক্লাসফ্রেণ্ড। ছেলেবেলায় দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

তার নাম কিন্তু সত্যিসত্যিই লাফাজদ্দি নয়। তার নাম উফাজদ্দি তরফদার। ছেলেবেলায় সে এত ব্যস্তবাগীশ ছিল যে, লিখতে গিয়ে যদি একটু কোথায়ও কাটাকুটি হ'ল ত অমনি সে সব ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে কেবল হাত-পা ছড়াত আর কাঁদত। ঘুড়ি সে কোনও দিনই উড়োতে পারেনি,—মাছ ধরতে গিয়ে যদি সুতোটা কোথায়ও একটু জড়িয়ে গেল ত ব্যস্! অমনি উফাজদ্দি ছিপটিপ ভেঙ্গেচুরে স'রে পড়ত সেখান থেকে।
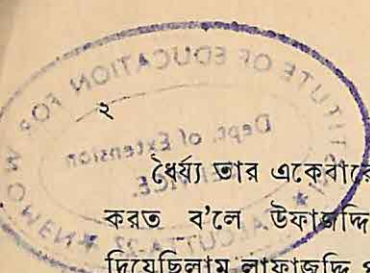
ধৈর্য্য তার একেবারেই ছিল না এবং সব কাজেই সে লাফালাফি করত ব'লে উফাজদ্দি তরফদারের বদলে আমরা তার নাম দিয়েছিলাম লাফাজদ্দি পগারপার।

লেখাপড়াও তার হ'ল না; কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব। তার কারণ, শীতকালে রোজ সন্ধ্যাবেলায় সে আমাদের 'সেজো রস' খাওয়াত।

'গাছি'
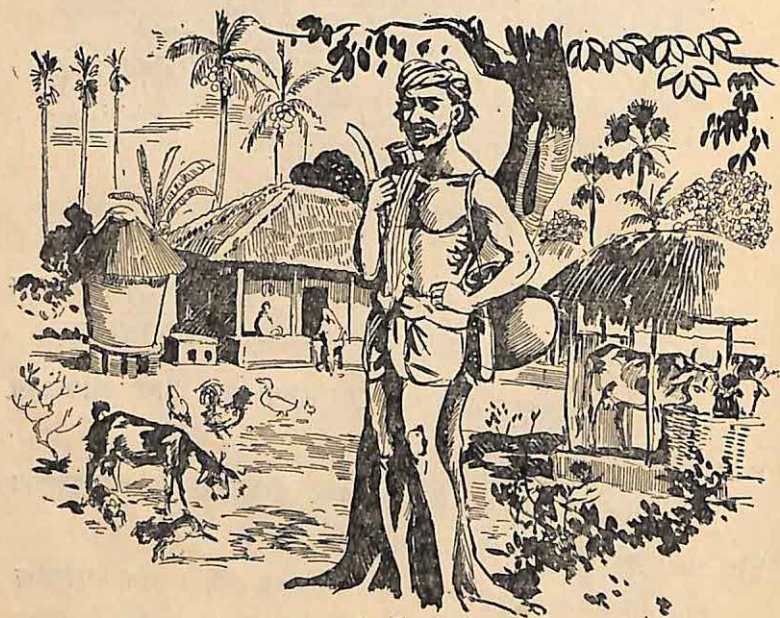
তার বাবা বছিরদ্দি ছিল একজন নামকরা 'গাছি'। দু'তিন পণ খেজুরগাছ সে নিজের হাতে কাটত। লাফাজদ্দির মা ধান ভানত, গুড় থেকে সুন্দর পাটালী তৈরী করত। বাঁশের কাঠি দিয়ে তার বাবা দোয়াড়, পোলো, বিত্তি আরও সব কত-কি মাছধরার যন্ত্র তৈরী ক'রে বিক্রী করত। বাঁশ দিয়ে খাঁচাও সে বেশ তৈরী করতে

পারত। তা' ছাড়া চাক থেকে মধু ভাঙ্গা, কি কারও নারকেলগাছ বাছাই ক'রে দেওয়াতেও তার আয় বড় কম ছিল না।

আমাদের এক আত্মীয় কোথায় চাকরী করতেন। লাফাজদ্দির বাবা এসে তাঁকে ধরল, 'বাবু, আমি ত চিরকাল মুখ্যু হয়েই রইলাম —ছেলেটা একটু লেখাপড়া যা হোক শিখেছে। এর একটা হিল্লে ক'রে দিন্ আপনি—যাতে ও মানুষ হতে পারে।'

লাফাজদ্দিকে তিনি সঙ্গে ক'রে চাকরীস্থলে নিয়ে গেলেন। আমরাও গ্রাম ছেড়ে পড়াশুনা করবার জন্য সহরে এলাম। তারপর প্রায় পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে। আজ এতদিন পরে হঠাৎ ব্যারাকপুর ষ্টেশনে সেই লাফাজদ্দির সঙ্গে দেখা।

কিন্তু এখন সে আর সেই পঁচিশ বছর আগেকার লাফাজদ্দি নেই। সে স্বাস্থ্য নেই, সে উৎসাহ নেই, সে লাফালাফিও আর নেই।

আমাকে নিয়ে গেল তার বাসায়—অর্থাৎ একটা পচা গর্ত্তের ধারে একটা নীচু স্যাঁৎসেতে গোলপাতার ভাঙ্গা ঘরের কাছে। সেখানে তার স্ত্রী আছে,—রোগা পেটমোটা কতকগুলো ছেলেমেয়েও আছে। তাদের কষ্টের অবধি নেই—না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র, না আছে মাথা গুঁজে থাকবার মত একটু স্থান।

লাফাজদ্দি গায়ে দিয়েছে কোনও মেম সাহেবের পরিত্যক্ত একটা অতি ময়লা ছেঁড়া কোট। তাতে তার দৈন্যদশা আরও বেশী ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে।

সে জানাল—সে ভাল একটা চাকরী চায়,—যাতে পেট ভ'রে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় এমন চাকরী।

বললাম—গ্রামে গিয়ে চাষ-আবাদ, কি গাছিগিরি যা হয় একটা কিছু কর। খাটতে পারলে বাংলার পল্লীতে ভাত-কাপড়ের কষ্ট হয় না।

কিন্তু তাতে তার মন উঠল না। তার বাপজান তাকে ঐ চাকরী ছেড়ে বাড়ী যাওয়ার জন্যে কতবার বলেছে। বাপকে খুশী করতে সে পারেনি। বুড়ো বাপ তাকে অভিশাপ দিয়ে মরেছে। আজ তার বাপ নেই—দেশে তার কেউ নেই আর। বাড়ী নেই, ঘর-দুয়ারও নেই। বহুকাল গ্রামছাড়া সে। নতুন জায়গায় কোথায় কি ভাবে গিয়ে সে উঠবে?

একদিন সেই গ্রামই কিন্তু তার নিজের বাসভূমি ছিল। তাদের ঝক্‌ঝকে নিকানো তিন-চারখানা চালাঘর ছিল,—গোয়ালে গরু ছিল,—ঘরে মধু মুড়ী গুড় আর নারকেলের অভাব কোনও দিনই হ'ত না। লাফাজদ্দির বাবা লেখাপড়াও জানত না, চাকরী-বাকরীও সে করেনি কখনও; কিন্তু দেহের স্বাস্থ্য ও মনের বল তার কিছু-মাত্রও কম ছিল না। তার বুড়ো বয়সেও আমরা তাকে 'বাইচের' নৌকোয় নেচে-নেচে গান করতে দেখেছি।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে লাফাজদ্দির কাছ থেকে ফিরে এলাম।

কেন এমন হয়? মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে এতখানি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল কেন?

আমি এখানে মাত্র একজন লাফাজদ্দির সন্ধান পেলাম, দেশে এমন হাজারে হাজারে লাফাজদ্দি বর্ত্তমান রয়েছে। একটু ভাবলেই বুঝা যায়, বছিরদ্দি যা করত এরা তা করে না—অর্থাৎ এক কথায় বাংলার কুটীর-শিল্পে অনাস্থাই হচ্ছে এই দুর্গতির কারণ।

তোমরা হয়ত বলবে, 'ধানভানা, পাটালী তৈরী করা, কি বাঁশের পোলো বিত্তি তৈরী করা আবার একটা শিল্প কাজ নাকি?'—হাঁ, শিল্প কাজ বৈ কি! যে এই শিল্প না জানে, সে ধান থেকে চাল বা রস থেকে পাটালী তৈরী করতে পারবে না। আর মৌমাছির চাক ভাঙ্গা যে বড় সোজা কথা নয় তা ত তোমরা বুঝতেই পারছ।

অনেক গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়, খেজুরগাছগুলো ডালপালা নিয়ে জঙ্গলের সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এমন একটি গাছি নেই যে গাছগুলো ঝুড়ে দেয়।

গ্রামে আমাদের অনেক সময় মৌচাকের পাশ দিয়ে ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করতে হয়; কিন্তু অনেক গ্রামেই এমন একটি লোক নেই যে মৌচাক ভাঙ্গতে পারে।
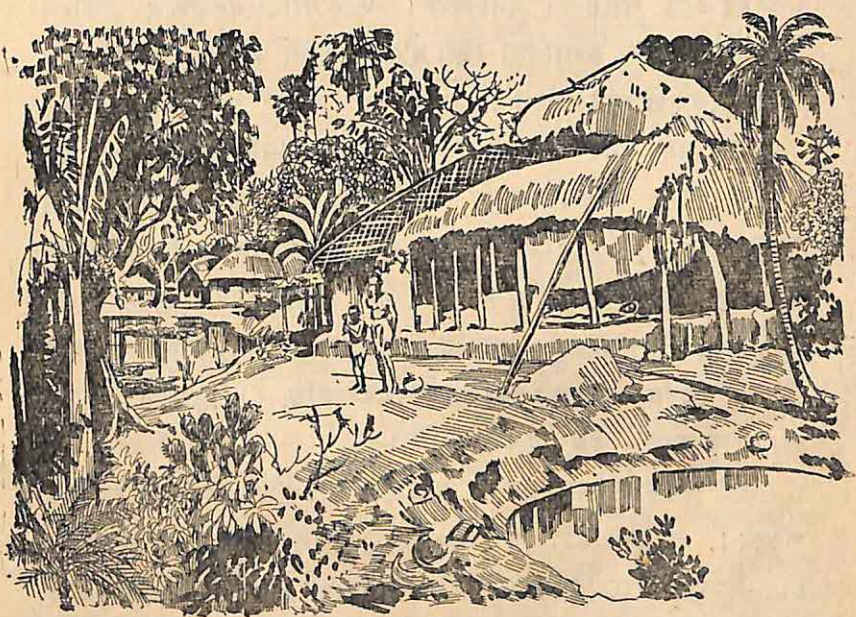
বাংলার পরিত্যক্ত পল্লী

মনে পড়ে পঁচিশ বৎসর আগেকার আমাদের বছিরদ্দির কথা। মৌচাক ভাঙ্গা ত তার এক ফুঁয়ের কাজ। একটা ভিজে বিচালীর তুবড়ীতে আগুন ধরিয়ে নিতে যতক্ষণ—তারপর বালতি আর গামলা বোঝাই মধু। এক-একটা চাকে সাত সের থেকে দশ-বারো সের পর্য্যন্ত মধু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মৌচাক ভাঙ্গবারও একটা

সময় আছে। যখন-তখন মৌচাক ভাঙ্গলেই তার থেকে মধু পাওয়া যায় না।

যে কথা হচ্ছিল। শিল্প বলতে আমরা কেবল সুতোর নিপুণ ও সূক্ষ্ম কাজকেই বুঝব না। যা কিছু করতে নৈপুণ্য লাগে, বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়, তাকেই শিল্প বা কলাবিদ্যা বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে এই কলাবিদ্যাকেই 'আর্ট' বলা হয়। কলাবিদ্যা কত রকমের হতে পারে তা' বলা শক্ত। তবে আমাদের দেশে একদিন চৌষট্টি প্রকারের কলাবিদ্যা ছিল ব'লে শোনা যায়। কিন্তু এখন তার অনেকগুলোই লোপ পেয়ে গেছে।

যা হোক, এই শিল্প বা কলাবিদ্যাকে আমরা সাধারণতঃ দুই রকমে দেখতে পাই। প্রথম, চারুশিল্প (ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফাইন আর্ট'); যেমন—সূঁচের সূক্ষ্ম কাজ, তুলি দিয়ে আঁকা চিত্রনৈপুণ্য, সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা এবং কাঠ বা পাথরের উপর ফুল, ফল, জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদাই করা প্রভৃতি। দ্বিতীয়, অর্থকরী শিল্প; যেমন—তাঁতের কাজ, গুড়ের কাজ, শাঁখারীর কাজ, স্যাকরার কাজ...এই রকম কত কি!

এই অর্থকরী শিল্পের মধ্যে আমাদের বছিরদ্দির পাটালী তৈরীও পড়বে। কারণ, ওটা করতে বুদ্ধি, কৌশল ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়, নামমাত্র খরচে স্বাধীনভাবে করা যায় এবং ওটা অর্থকরীও বটে—অর্থাৎ ওর থেকে আমাদের দু'পয়সা আয়ও হতে পারে। অবশ্য ধান-পাট বা কাপাসের চাষ শিল্প নয়, ওটা কৃষি। মাছধরাও তাই। কৃষি সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করব।

এখানে মনে রাখতে হবে, চারুশিল্পও অর্থকরী শিল্প হতে পারে যদি তার থেকে অর্থাগম হয়, আবার অর্থকরী শিল্পও চারুশিল্প হতে

পারে যদি অর্থের চেয়ে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিকেই শিল্পীর বেশী লক্ষ্য থাকে।

ধান-পাট বা কাপাসের চাষ শিল্প না হলেও ধানভানা, ভাত-রাঁধা, দড়ি-শিকে তৈরী, কাপাস থেকে সুতো কাটা, তাঁত বোনা—এগুলো শিল্প।

কুটীর-শিল্পের অনাদর হওয়াতেই বাংলায় আজ এত বেশী লাফাজদ্দির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই কুটির-শিল্প কি, কেনই বা তার অনাদর হয়েছে—কতখানি তার উন্নতি হয়েছিল এবং বর্ত্তমানেই বা তার অবস্থা কি—এসব আমাদের জানা দরকার।

বাংলার কুটীর-শিল্প ধ্বংস হ'ল কেন?

"I do not know much about the tariff ; but I do know this much, when we buy goods abroad we get the goods and the foreigners get the money ; when we buy goods made of home, we get both the goods and the money." —Abraham Lincoln.

কুটীর বা উটজ শিল্প বলতে আমরা বুঝব, যে শিল্প স্বাধীনভাবে ঘরে ব'সে অল্প খরচে বা বিনা-খরচে একটা পরিবারের মধ্যে চলতে পারে; সুতরাং চারুশিল্প এবং অর্থকরী শিল্প দুইই কুটীর-শিল্পের মধ্যে পড়ে। তবে সাধারণতঃ আমরা কুটীর-শিল্পকে অর্থকরী শিল্পের মধ্যেই গণ্য করি; কারণ, যে শিল্পে পরিশ্রম-অনুযায়ী দু'পয়সা ঘরে না আসে, তাতে দেশের এবং দশের আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে বিশেষ লাভ নেই। প্রধানতঃ এই কারণে আমাদের দেশের অনেক শিল্প লোপ পেতে বসেছে। একখানা ঢাকাই মসলিন করতে যে সময় এবং পরিশ্রম লাগে, ক্রেতার কাছ থেকে তার উপযুক্ত মূল্য

পাওয়া যায় না—সাধারণের পক্ষে তত বেশী মূল্য দেওয়া সম্ভবও নয়। প্রধানতঃ এই জন্য ঢাকার সে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন এখন আর নেই—যা আছে তা কৃত্রিম এবং বিদেশী সুতোয় তৈরী।

ঢাকার মসলিন দেশের লোকের প্রয়োজনে ও উৎসাহে একদিন গ'ড়ে উঠেছিল এবং উন্নতিও করেছিল যথেষ্ট। আজ তা' লোকে ব্যবহার করে না; তার কারণ একমাত্র এই নয় যে লোকের পয়সা নেই—তার কারণ বরং এই যে, লোকের সে মন নেই, অর্থাৎ নিজের দেশের জিনিস ব'লে দেশের লোকের একটা আকর্ষণ নেই। তাই বাংলার পল্লী-গীতি, পল্লী-জীবন এবং কুটীর-শিল্প আজ অনাদৃত হয়েছে।

লোকে এখন ঢাকাই বা শান্তিপুরে দেশী ভাল কাপড়ের চেয়ে ঢের ঢের সস্তা দামে বিদেশী তথাকথিত ভাল কাপড় পায়। কিন্তু একথাও ঠিক যে, দেশী ভাল ভাল কাপড়গুলোর উৎপত্তি থেকে এ পর্য্যন্ত যদি তার উপর দেশের লোকের আন্তরিক আকর্ষণ থাকত, তা'হলে খাঁটি দেশী কাপড়ের দামও আজ বিদেশী কাপড়ের চেয়ে বেশী হ'ত না। আসাম প্রদেশের মতন বাংলার ঘরে ঘরে তাঁত চললে বস্ত্র-সমস্যা থেকে বাঙ্গালী অনেকটা নিষ্কৃতি পেত এ-কথা নিশ্চয়।

কোনও জিনিস নিজের হাতে তৈরী ক'রে নেওয়ার মধ্যে যে আত্মগৌরব-বোধ আছে তা' আমাদের মোটেই নেই। আমরা প্রায় সকলেই চাকরী পাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি কতকগুলো পাশ করি এবং পাশ ক'রেই চাকরীতে ব'সে আর সহরবাসী হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে যাই। আমরা ভুলে যাই, বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯২ জন পাড়াগাঁয়ে বাস করে। আমরা শিক্ষিত হয়ে ভুলে যাই যে, বাংলার আশি সহস্র পল্লীই বাংলার আর্থিক মেরুদণ্ড!

বিদেশী জিনিসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে আমরা একথাও ভুলে যাই যে, বাংলা কেবল কৃষিপ্রধান দেশ নয়, বাংলা শিল্প ও বাণিজ্যের দেশ। বাংলার শিল্প একদিন কতখানি বিস্তৃতি লাভ করেছিল বাংলার প্রাচীন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

কিন্তু এই শিল্পীর দেশ বাংলার সাত কোটি সন্তানের মধ্যে মাত্র বারো লক্ষ জন শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। চাকরীর মোহে এই শিল্প-ব্যবসায়ীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমেই কমে আসছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দেও যারা শিল্প-ব্যবসায় করত এখন তাদের সংখ্যা কমে প্রায় অর্দ্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিতল-কাঁসার থালা বাসন ইত্যাদি আমাদের দেশের একটা খুব প্রসিদ্ধ কুটীর-শিল্প। কিন্তু এখন বাংলার ঘরে ঘরে এ্যালুমিনিয়াম, জার্মান সিলভার প্রভৃতি যে ভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসতে সুরু করেছে, তাতে ভয় হয় অচিরকাল মধ্যেই দেশের কাঁসারী এবং হাঁড়িগড়া কুমোরের সংখ্যা লোপ পেয়ে যাবে।

ডালের বড়ি, কাসুন্দি, চাটনী, আমচুর, আমসত্ব, আচার এসব খাঁটি দেশী খাদ্য জিনিস দেশ থেকে প্রায় উঠে যেতে বসেছে। এখন তার বদলে সহরের অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে চলেছে—'সচ' অথবা বিদেশে প্রস্তুত জেলী। আর এই জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে ভারতে আমদানী হচ্ছে ছ'লক্ষ আটান্ন হাজার টাকার জ্যাম আর জেলী। বাঙ্গালী তার চিড়ে গুড় নারকেল খাওয়ার শক্তি হারিয়েছে —মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার কথাও ভুলে গেছে। তাই প্রতি বৎসর গড়ে এখন ভারতে বিদেশ থেকে তেত্রিশ লক্ষ টাকার কেক, বিস্কুট আমদানী হচ্ছে।

শাঁখা পরা ত আজকাল আমাদের দেশে—বিশেষ ভাবে পশ্চিম-বঙ্গে, রুচিবিরুদ্ধ হয়েই দাঁড়িয়েছে। বুড়োদের গরজে প'ড়ে মেয়েরা

কেউ কেউ হয়ত দু'একগাছা শাঁখা হাতে না প'রে পারেন না, কিন্তু তাঁদের আন্তরিক ঝোঁক গিয়েছে ঐ বিদেশী রঙিন কাচের চুড়ীর উপর। কারণ বোধ হয় এই যে, শাঁখার চেয়ে বিদেশী চুড়ীর চাকচিক্য ঢের বেশী। অথচ এদেশেই একদিন শাঁখা-সিন্দুরে এয়োস্ত্রীর লক্ষ্মীশ্রী ছিল।

বাংলার সহরের মেয়েরা অনেক স্থলে আজকাল মেম সাহেবদের বিলাস-ব্যসন অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন। মেয়েদের এইরূপ বিদেশী দ্রব্যে অনুরাগ দেশীয় শিল্পের ক্ষতির কারণ। বিদেশজাত দ্রব্যে যাদের প্রীতি তাদের বাংলার মহিলা-কবির কথা মনে রাখতে হবে—

'আপনারে যে ভেঙ্গে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে—
অলীক, ফাঁকি মেকি সে-জন নামটি তার ক'দিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যা রে,
খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথায়ও পাবি না রে।'

মনে রাখতে হবে তাদের—বিলাসিতা কোনও দেশের বা জাতির পক্ষে তত বেশী অমঙ্গলের কারণ হয় না যদি সে-বিলাসিতা স্বদেশ-প্রীতি ও দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। কেবলমাত্র বিলাসিতার জন্য যাঁরা খদ্দর পরেন, তাঁরাও এক দিক দিয়ে দেশের মঙ্গল করেন সন্দেহ নেই।

এ সম্বন্ধে মেম সাহেবদের মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ। কোনও মফঃস্বল সহরের একজন বিশিষ্ট ইংরেজ কর্ম্মচারীর মেম সাহেব একবার তাঁর আরদালীকে দোকান থেকে কয়েকটা জিনিস আনতে বলেছিলেন। আরদালী দেশী জিনিস নিয়ে গিয়েছিল ব'লে তক্ষুণি তা ফেরত দিয়ে মেম সাহেব তাঁর নিজের দেশের জিনিস কিনিয়ে আনেন।

বাংলার কুটীর-শিল্পের প্রতি বিদেশী কর্ম্মচারীদের স্থল-বিশেষে

এইরূপ মনোভাব সম্বন্ধে তাঁদের বিরুদ্ধে বলবার হয়ত কিছুই নেই, কিন্তু দেশের যাঁরা সাহেব-মেমকে অনুকরণ করেন, তাঁরা সাহেব-মেমদের এই মনোবৃত্তিটাকে কেন আয়ত্ত করেন না এটিই আমাদের দুঃখ।

বাংলার যেখানে-সেখানে মেলার ব্যবস্থা হয়ত একদিন কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পেই হয়েছিল। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া একেবারেই উল্টে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যে কোনও মেলায় গেলে দেখা গেছে, বাংলাদেশের এই মেলাগুলো জাপানী মেলায় পরিণত হয়েছে! পাটি, লাঠি, ছুরি, কাঁচি, রুমাল, সেন্ট্, পুতুল, কাপড়, কাগজের ফুল, কাচের গ্লাস, তেল, আলতা, সাবান, আসন, ঘুড়ি, গ্রামোফোন, এমন কি পূজো করবার তামার কোষা-কুষিগুলো পর্য্যন্ত জাপানী! শুনেছি, বাজারে জাপানী হরিনামের থলেও নাকি বিক্রী হয়েছে!

গলদ কোথায়?

"আমাদের মনোভাবের ফলে আমরা আজকাল বাংলার পল্লীগ্রামের যে সকল সহজজাত শিল্পধারাকে অবজ্ঞা ক'রে থাকি সেগুলো যে আমাদের নাগরিক শিল্পের চেয়ে উঁচুদরের এই অনুভূতি আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।" —গুরুসদয় দত্ত

যুদ্ধের আগেও বাজারের যে কোন মনোহারী দোকানের এমন কোন জিনিস ছিল না যা' জাপানী নয়। হায়, বাংলার কুটীর-শিল্প! দেখবে, কোন মেলা কি হাটে হয়ত এক কোণে বটগাছের অন্ধকার ছায়ায় কতকগুলো মুচি টিনের ল্যাম্প জেলে তাদের হাতে তৈরী

তালপাতার পাখা, ধামা, কুলো, চালনী নিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে। দেশী কুমোরদেরও সেই দশা। যত ভীড় জাপানী জিনিসের জমকালো দোকানে। দেশী ছুঁতোর, কামার, শাঁখারী এরা সব গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে—তাদের কাছে বড় একটা কেউ ঘেঁসে না।

দেশের এক্‌জিবিসান্‌ বা প্রদর্শনীগুলোর প্রায় এই দশা। যে কোন প্রদর্শনীতে গেলেই দেখা যাবে, বিদেশী জিনিস সেখানে আসর জমিয়ে ব'সে আছে।

নদীয়া জেলার কোনও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত একটা 'কৃষি-শিল্প' প্রদর্শনীর কথা আমি জানি। সমস্ত 'ষ্টল'গুলোই প্রায় বিদেশী জিনিসে বোঝাই! সভাপতি রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর দেশীয় শিল্পের দুর্গতির জন্য দুঃখ ক'রে বললেন, 'একটা কিছু জিনিস আমি দেখতে চাই এখানে যা খাঁটি দেশী—যা দেশের কৃষকেরা তৈরী করেছে নিজের হাতে তাদের জমিতে।'

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষরা তা দেখাতে পারলেন না। তাঁরা কৃষকদের শৈথিল্যের কথা উল্লেখ ক'রে নিজেদের ত্রুটি ক্ষালন করলেন।

কথাটা খুবই সোজা: 'কৃষকদের বলেছিলাম, কিন্তু তাঁরা কেউ কিছু আনেনি দেখছি।' কৃষক যারা, গরীব যারা, অশিক্ষিত যারা তাদের সঙ্গে আমাদের যোগ ঐ 'বলেছিলাম' পর্য্যন্ত! দেশের কৃষি এবং শিল্পের ভার পড়েছে অশিক্ষিত যারা তাদের উপর, অথচ তাদের সঙ্গে শিক্ষিত যারা তাদের কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই। যাঁরা পাঁচশো ছেলের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলছেন সেই শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁদের ছেলেদের নিয়ে বিদ্যালয়ের বিস্তৃত কম্পাউণ্ডে কি একটা কিছুই তৈরী ক'রে দেখাতে পারেন না? কেবল পরের উপর নির্ভর করলেই কি কর্ত্তব্য হয়?

প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষদের কৃষক ও শিল্পীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন

হতে হবে। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাজ নিতে হবে। নতুবা তারা কখনও আনন্দ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে মেলায় যোগদান করবে না। তারা ভাববে প্রদর্শনী 'বাবু'দের জন্য—ভদ্র এবং শিক্ষিত যারা তাদের জন্য।

দশ বৎসর আগেও সুদূর পাড়াগাঁয়ের রথের মেলায় যে সব কাঠের ঘোড়া, গাড়ী, নৌকো, বাঁশের চালনী, মাছ রাখবার খালুই, দুধ ঢাকবার ঢাকনী, শোলার ফুল, পাখী এবং মাটির পুতুল ও বাঁশী বিক্রী হতে দেখা গেছে, এখন আর সেগুলোর বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যুদ্ধের আগে পাঁচ বৎসরে বাংলাদেশে ৩৫ লক্ষ টাকার বোতাম এবং ৩৭ লক্ষ টাকার খেলনা বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছিল—অথচ সেগুলো তৈরী করতে যা কিছু মাল-মসলা লাগে তার সমস্তই দেশে পাওয়া যায়।

কয়েক বৎসর আগে কলকাতার মাড়োয়ারী এসোসিয়েসনের এক সভায় সভাপতি বৈজনাথ বাজোরিয়া জাপানী জিনিসের অবাধ আমদানী ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত বিষয় দেশের পক্ষে কল্যাণকর সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁরই জাতি ভাই মাড়োয়ারী এজেন্টদের দ্বারা যে এইসব বিদেশী সস্তা মাল বাংলার ঘরে ঘরে চালান দেওয়া হচ্ছে—একথা তাঁকে কে বুঝিয়ে বলবে? কে বলবে, যুক্তপ্রদেশ এবং পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে কুটীর-শিল্প বিক্রয়ের ব্যবস্থা যে রকম লাভজনকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, বাংলাদেশেও সেরকম কোন ব্যবস্থা না করলে বাংলার কুটীর-শিল্প রক্ষা পাবে না?

আমরা কেবল বিদেশী 'মাকাল ফল' দেখে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে আছি—তাদের দেশের ধার-করা বিলাতী বুলি ঝেড়ে আমরা বাহবা নিচ্ছি; কিন্তু দেশের প্রতি সত্যিকারের গভীর দৃষ্টি এবং দরদ

আমাদের কয়জনের আছে? রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন—'আমরা গ্রন্থ-কীট; দেশের গভীর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরেজী স্কুলের স্কুল-বয়—সেজন্য পুঁথির নজির অনুকরণ ক'রে বিদেশীয় শিল্প-কলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ; কিন্তু সেই রসবোধ আমাদের নেই যাতে ঘরের কাছে, সাধারণের মধ্যে যেসব সৌন্দর্য্য-প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি।'

বই প'ড়ে শিল্প সম্বন্ধে জানা আর অভিজ্ঞ লোকের উপদেশ নিয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখা এক কথা নয়। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে, নানা রকম পরীক্ষা ক'রে, এমন কি কোথাও কোথাও অকৃতকার্য্য হয়েও আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

আমাদের দেশের কেউ কেউ এমন ধারণাও পোষণ করেন যে, এই বিংশ শতাব্দীর উন্নতির যুগে আমরা বিশ্ব-সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছি। আজ বাংলার সেই শিল্পটাই বেঁচে থাকবে যার শক্তি আছে এবং অন্যের সংঘাতে যার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়। তাঁরা বলেন, বিশ বছর আগেও কালীঘাটের পটুয়ারা যে ছবি আঁকত, আজ তার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না; তার কারণ, কালীঘাটের সে পটের ছবি আর এখন চলে না। এখন শিল্পীরা তার চেয়ে ঢের ঢের ভাল ছবি আঁকছেন।

এই দেশের পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা আগে চুল বাঁধত সজারুর কাঁটা কি অবস্থা-বিশেষে স্যাকরার তৈরী রূপো বা সোনার কাঁটা দিয়ে। কিন্তু এখন তা উঠে গেছে। এখন সেই জায়গায় কত রকমারি মাথার কাঁটা বাজারে উঠেছে। দেশের সে 'প্রিমিটিভ'—সে গেঁয়ো ভাব আর নেই!

এঁদের ধারণা, দেশীয় শিল্পের (অর্থাৎ যে দেশীয় শিল্প চলতে পারে

তার) উন্নতি হয়েছে। এখন আর কেউ 'চকমকি' পাথর ঠুকে অথবা গন্ধকের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালে না। তাঁরা স্বীকার করেন, দেশে অবশ্য এমন একটা সময় এসেছিল যখন বিদেশীরা দেশলাই না পাঠালে আমাদের উনুন জ্বলত না; কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন দেশে দেশলাইর বড় বড় ফ্যাক্টরী খোলা হয়েছে—ইত্যাদি।

ভাববার কথা। শিল্পী আজ যে ঢের ঢের ভাল ছবি আঁকছেন তার সব কি দেশী ছবি? জাপানের ছবি দেখলেই যেমন বুঝতে পারা যায় যে সেগুলো জাপানী,—তেমনি সে "ভাল ছবিগুলো" দেখলেও কি বুঝতে পারা যায় যে, সেগুলো বাংলার নিজস্ব ভাবধারায় আঁকা? গাঁয়ের মেয়ে যে বিনিপয়সায় তৈরী সজারুর কাঁটা কি স্যাকরার তৈরী মাথার কাঁটা ফেলে দিয়ে এখন বিদেশী কাঁটা মাথায় তুলে নিয়েছে—সেটা কি উন্নতির লক্ষণ? নিজের ব্যক্তিত্বকে, জাতীয়তাকে—দেশকে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল পরের তৈরী জিনিস এবং পরের জিনিস গ্রহণ করলে যদি উন্নতি হয়, তা'হলে আমাদের লাফাজদ্দিরও খুব উন্নতি হয়েছে বলতে হবে। কারণ, তার বাবা কোন দিন কাঁটা-জামা চোখেও দেখেনি; কিন্তু এখন লাফাজদ্দির গায়ে উঠেছে বিলাতী মেম সাহেবের পরিত্যক্ত এবং নিলামে বিক্রীত ছেঁড়া কোট। উন্নতি অনেকখানি হয়েছে বলতে হবে।

চকমকি পাথরটা আগুন জ্বালার পক্ষে খুব সহজ উপায় ছিল না, এটা আমরা মানি। কিন্তু আমাদের লাফাজদ্দির পক্ষে ফ্যাক্টরীর দেশলাই যোগাড় করা কি খুব সহজসাধ্য হয়েছে? তা ছাড়া ফ্যাক্টরীগুলো আজ যদি কোনও আকস্মিক কারণে উঠেই যায়, অথবা কোন সরকারী বা বে-সরকারী বিশেষ কারণে তারা জোট বেঁধে বলে, আমাদের এক-একটা দেশলাইয়ের কাঠির দাম এক

পয়সা—তা'হলে আমাদেরই বা উপায় কি হবে? গত মহাযুদ্ধে আমরা কি সে শিক্ষা পাইনি? বাড়ীর ইঁদারা-পুকুর ছেড়ে যাঁরা কলের জলের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছেন, অথবা বাড়ীতে তেলের প্রদীপ তুলে দিয়ে কেবল মাত্র যাঁরা বিদ্যুতের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছেন, তাঁরাই জানেন কলওয়ালার মর্জ্জি না হলে মাঝে মাঝে কতখানি অসুবিধা হয়। 'ব্ল্যাক আউটে' বিজলী বাতিতে যাঁদের ঢাকনী লাগাতে হয়েছে, বা কেরোসিনের অভাবে যাঁদের অন্ধকারে থাকতে হয়েছে, অবস্থাটা তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়।

আজকাল আমরা চিনি, কেরোসিন, কাপড়, আটা প্রভৃতির জন্য যে এত কষ্ট পাচ্ছি, কলের উপর অত্যধিক নির্ভরতা তার প্রধান কারণ।

পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে থাকার চেয়ে—আত্মনির্ভরতা—সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার দাম ঢের বেশী।

[ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বাংলা প্রদেশের লোক-সংখ্যা বেশী। এখানে প্রতি বর্গ মাইলে ৭৪২ জন লোক বাস করে।]

অভাব কিসের?

সেদিন বীরনগর ষ্টেশনে দেখলাম, মামা ভাগনের ঝগড়া লেগে গেছে।

ভাগনে বলছে—'তখনই বলেলাম মামু এলে (রেলে) চ'ড়ে কাজ নেই। 'তাক' আকতে (রাখতে) পারবা না। ওর নাইন (লাইন) ঠিক ক'রে চলা কি সোজা কথা? এখন নেও ঠ্যালা!'

'মামু' কিন্তু বোকা হয়ে গেছে। কোনও কথা বলছে না।

ব্যাপারটা এই—

মামা ও ভাগনের বাড়ী বনগাঁর কাছে কোন্ পাড়াগাঁয়ে। মাঠের কাজ কিছু না থাকায় তারা রাণাঘাটে এসেছিল 'মুনিষ' খাটতে। কয়েকদিন ইটখোলায় 'জনের কাজ' ক'রে সেদিন বাড়ী ফিরছিল। রাণাঘাট থেকে তাদের বাড়ী মাইল দশেক হবে। ভাগনের ইচ্ছা হেঁটেই যায়। কিন্তু মামা বললে, হাতে যখন পয়সা রয়েছে তখন রেলের গাড়ীতেই যাওয়া যাক্।

কিন্তু রাণাঘাট ষ্টেশনে অনেকগুলো লাইন থাকায় ওরা ভুল ক'রে কৃষ্ণনগরের গাড়ীতে উঠে পড়েছে। গাড়ী যখন চুর্ণী ব্রীজ পার হয় তখন ভাগনের চৈতন্য হ'ল।

'হ্যাদে মামু, গাড়ী রদী (নদী) পার হয় ক্যানে ?' মামুও দেখল, 'তাই ত! এডা কি হল!'

তারপরই বীরনগর ষ্টেশন। ষ্টেশনে নেমে যখন তারা শুনল যে, ফিরে রাণাঘাট যেতে হলে তাদের আবার টিকেট করতে হবে, তখন ভাগনের হ'ল ভয়ানক রাগ : 'তখনই বলেলাম মামু 'তাক' আকতে (রাখতে) পারবা না। 'এলে' চ'ড়ে কাজ নেই। এখন গাটের পয়সা দিয়ে ফিরে আবার 'টিকিশ' কর!'

অবশেষে তারা গাড়ীতে ফিরে না গিয়ে বীরনগর থেকে হেঁটেই বাড়ী রওনা দিল।

গরীব মানুষ একটু 'এলের' গাড়ীতে চড়েছে ব'লে যে আমি এদের ঈর্ষ্যা করছি তা নয়। দুঃখ এই, কেবল 'এলে' নয়—সমস্ত জীবনটাতেই তারা এই রকম 'তাক' রাখতে পারে না। ফলে যা কিছু পুঁজিপাটা এদের তাও যায় এবং খেটেও মরে।

এরা অর্থ আয় করতে জানে না। 'কাঁচা মাল' বিক্রী ক'রে এরা সমস্ত জিনিসে লোকসান দেয়। অর্থ রাখতেও এরা জানে

না—হাতে দু'পয়সা এলেই এরা তা খরচ ক'রে ফেলতে পারলে বাঁচে। এরা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমবিমুখ। বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা পশ্চিম ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষকদের পাথর খুঁড়ে আবাদ করতে হয়—মাথায় ক'রে জল তুলে জমিতে দিতে হয়। বাংলার কৃষকদের কিছুই করতে হয় না বললেও হয়। তবুও আবাদের অভাবে বাংলায় অনেক জমি প'ড়ে থাকে।

পূর্ব্বে বাংলার পল্লীবাসীরা কৃষিকাজ ক'রে হাতে যেটুকু সময় পেত তা কুটীর-শিল্পে সদ্ব্যবহার করত। এখন কুটীর-শিল্প তারা ভুলে গেছে, অলসতা এসে তাদের দুর্ব্বল ক'রে দিয়েছে। এখন চাই তাদের শিক্ষা—চাই তাদের ঠিক পথে চলবার বুদ্ধি—আর চাই কুটীর-শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার।

দেখা গেছে বাঙ্গালী শিল্পী বা কৃষককে অনেক সময় সহকারীর অভাবে কাজ ছেড়ে দিতে হয়। একা একা সব কাজ করাও সম্ভব নয়। এই জন্য যদি শিল্পীদের মধ্যে একটা একতা বা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সুযোগ ঘটে তা'হলে তারা অনেক কিছুই করতে পারে। উৎপন্ন জিনিস বিক্রী সম্বন্ধেও শিল্পীদের একটি সঙ্ঘবদ্ধ মতামত থাকা দরকার। একতায় শক্তি বাড়ে একথা সকলেই জানে; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলায় শিল্পী, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে প্রায়ই পরস্পর কলহ ও ঈর্ষ্যা-দ্বেষ দেখা যায়।

পাখীদের সম্বন্ধে শোনা যায়, যুগযুগান্তর ধ'রে তারা একই রকমের বাসা নির্ম্মাণ ক'রে চলেছে। বাংলার কুটীর-শিল্প এবং কৃষি সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথা খাটে। পুরুষানুক্রমে এরা একই রকমে কাজ ক'রে যাচ্ছে। ঐ সব শিল্প বা কৃষির উৎকর্ষ সাধন করবার উৎসাহ বা ইচ্ছা তাদের নেই। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Old order changeth yielding place to new" অর্থাৎ চিরদিন কোনও

প্রথা একই ভাবে চলতে পারে না—তাকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবেই। নতুবা সে টিকবে না।

পূর্ব্বে যে সব যন্ত্রে বা যে প্রথায় শিল্প-বস্তু উৎপন্ন হ'ত, এখন তা করতে গেলে চলবে না। নতুন উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি করতে হবে এবং শিল্পীকে কাল-ধর্ম্ম ও দেশের রুচি অনুসারে প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে হবে।

আগেকার দিনের গিন্নীরা নাকে 'নথ' পরতেন এবং মেয়েরা পায়ে 'মল' পরত। কোনও শিল্পী এখন যদি নবীন উৎসাহে সেই 'নথ' আর 'মল' তৈরী করতে আরম্ভ করে তা'হলে তা চলবে না।

কেবল ধাতুশিল্প কেন, বস্ত্রশিল্প, দারুশিল্প এবং সর্ব্ববিধ শিল্পেই ঐ কথা বলা যেতে পারে। শিল্পীকে এখন দেশের রুচি অনুসারে নতুন নতুন ডিজাইনের জিনিস দিতে হবে।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে গেলে টাকা চাই এবং সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই।

দেশের স্থানে স্থানে যে 'সমবায় সমিতি' গঠিত হয়েছে তার থেকে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে টাকা ধার নিয়ে শিল্পীরা একটা কিছু করতে পারে। কিন্তু তারা যে টাকা নিচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রে একটা কিছু করবার জন্য নয়—একটা কিছু ক'রে ফেলে তার দণ্ড দেওয়ার জন্যে। ফলে এই সব ঋণদান-সমিতির কাজ আশানুরূপ হচ্ছে না।

কোনও জিনিস উৎপন্নের কথা যেমন ভাবতে হবে, তার চেয়ে বেশী ভাবতে হবে তার কাটতির কথা। আমাদের দেশে কৃষি-উৎপন্ন জিনিস যেমন হাটে ও মোকামে বিক্রী হয়, শিল্প-জিনিস তা বড় একটা হয় না। বিশেষ বিশেষ দোকানে এবং 'মেলা'তে শিল্প-জিনিসের কাটতি হয়। গ্রামে গ্রামে উৎপন্ন শিল্প-সামগ্রী যাতে সহজে ও উপযুক্ত লাভে বেচতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা থাকা

উচিত। পল্লীবাসীর অজ্ঞাত যে ছুটি কমার্শিয়াল মিউজিয়াম কলকাতায় আছে, তাতে দ্রষ্টব্য হিসাবে কোন কোন কুটীর-শিল্প স্থান পায়, বেচবার সুব্যবস্থা সেখানে নেই।

'বাংলার স্বদেশী শিল্পের যে পুনরুত্থান হয় না তার প্রধান কারণ, বাঙ্গালী উদ্যমহীন, অলস ও আরাম-প্রিয়। আবেগপূর্ণ ভাবপ্রবণতার দ্বারা আমরা হনুমানের মত এক লম্ফে সাগর পার হতে চাই!'

—'জাতি গঠনে বাধা' (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

বাংলার কুটীর-শিল্প

কুটীর-শিল্প বলতে আমরা কোন ফ্যাক্টরী বা জনসঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত লিমিটেড্ কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্যকে বুঝব না। কুটীর-শিল্প হচ্ছে সেই শিল্প—যার উপর নির্ভর ক'রে কোনও ব্যক্তি বা কোনও পরিবার সহজে স্বাধীনভাবে চলবার সুযোগ ক'রে নিতে পারে। কুটীর-শিল্প জাতীয় ভাবধারার সাক্ষ্য। কোন্ জাতি কতখানি উন্নত হয়েছে—তার কুটীর-শিল্পই তা' তাকে জানিয়ে দেয়। যারা জাতীয় কুটীর-শিল্প ভুলে যায় তাদের 'আত্মবিস্মৃত জাতি' বলতে হবে।

বাংলার কুটীর-শিল্পের আদর্শকে লক্ষ্য ক'রেই গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে একদিন জাতি বিভাগ হয়েছিল অর্থাৎ এক একটা শিল্প নিয়ে এক-একটা জাতি (যেমন—কাঁসারী, শাঁখারী, মালাকার, কুম্ভকার, ছুঁতার প্রভৃতি) গ'ড়ে উঠেছিল। শিল্পকাজে এই রকম জাতিগত ভেদ হওয়ায় এই সুবিধা হয়েছিল যে, প্রত্যেক শিল্পী তার আপন আপন শিল্পে জন্মগত অধিকার নিয়ে বড় হ'ত এবং অতি

শৈশব থেকে কোনও শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্ফুট হ'ত।

সেই জন্য স্থান-বিশেষে কোন কোন শিল্প একদিন চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল,—তার কোন কোনটার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়, কোনটার বা চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে।

বস্ত্র-শিল্প

"পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা ;
নব-বৎসরে করিলাম পণ—লব স্বদেশের দীক্ষা।"

যারা কাপড় বোনে তাদের মধ্যে তিনটে শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায় ; এক—তাঁতী—এরা সূক্ষ্ম সুতোর বা রেশমের ভাল কাপড় তৈরী করে ; যেমন—শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, বাগেরহাট, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের তাঁতীরা।

আর এক শ্রেণী—জোলা এবং যোগী। এরা গামছা, লুঙ্গি, মশারীর কাপড় ইত্যাদি তৈরী করে।

আর এক শ্রেণী আছে যারা কাঠির সাহায্যে হাতে ভেড়ার লোমের কম্বল, নারিকেলের দড়ির পাপোষ, কার্পেট, সতরঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করে। এদের কোন তাঁত নেই, কাজেই এদের তাঁতী বলা হয় না।

উপরি উক্ত তাঁতী বা জোলা-যোগীর সংখ্যা দেশে ক্রমেই হ্রাস হয়ে আসছে। যোগী-হাজারে ৪০৮ এবং জোলা হাজারে মাত্র ৩৭৯ জন আজকাল তাদের জাত-ব্যবসা করে। অবশিষ্টের অধিকাংশই জাত-ব্যবসায় ছেড়ে চাকরী-জীবী হতে চেষ্টা করছে ; কারণ এদের ব্যবসায় এখন মন্দা। না হবেই বা কেন ? দেশে এত কাপড়ের কল

হওয়া সত্ত্বেও এখনও বাংলায় প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার কাপড় বাইরে থেকে আমদানী হচ্ছে—অথচ দেশের তাঁতী বেকার!

শান্তিপুরে আগে বহু সহস্র ঘর তাঁতী বাস করত। এখনও সেখানে অনেকগুলো তাঁত চলে। কিন্তু আগের সুদিন আর তাদের নেই। কেন নেই তার অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আপাততঃ শান্তিপুরে বস্ত্র-শিল্পের একটা ঘোর প্রতিবন্ধক দেখা যাচ্ছে—
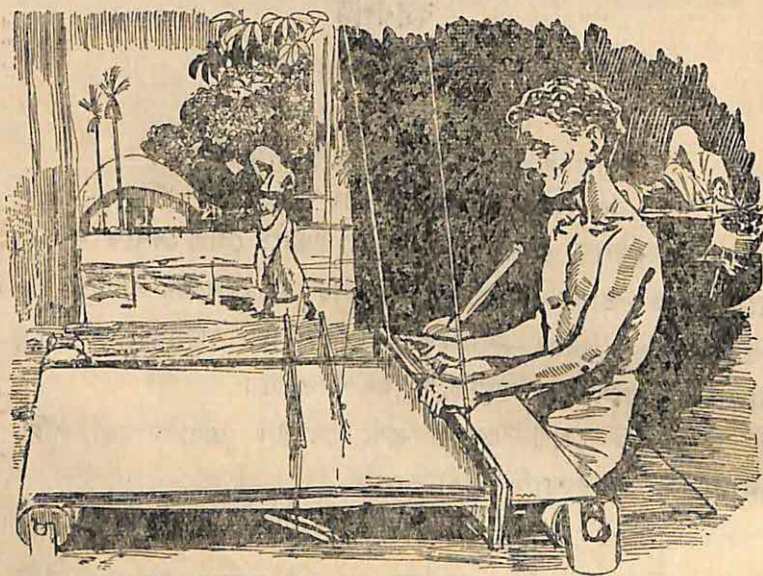
মহাজনের জোচ্চুরি! শান্তিপুর সূক্ষ্মবস্ত্রের জন্য যতখানি প্রসিদ্ধ, 'ডিজাইন' বা কারুকার্য্যের জন্য তার চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। শান্তিপুরে তাঁতীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি এখনও বর্ত্তমান আছেন, যিনি যে কোন ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি বা ফটো দেখে অনুরূপ ছবি কাপড়ের উপর তুলে দিতে পারেন। শোনা যায়, সমগ্র ভারতের মধ্যে এখনও একমাত্র ইনি অতি সুন্দরভাবে এই কাজটি করতে পারেন। সম্রাট

পঞ্চম জর্জ্জের একটি ফটো কাপড়ের উপর তুলে ইনি পাঁচশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মহাজনদের জোচ্চুরির কথা হচ্ছিল। একখানা প্রকৃত শান্তিপুরে ভাল কাপড়ের উপর কারুকার্য্য করা হলে তার দাম বারো টাকা থেকে একশ'-দেড়শ' টাকা পর্য্যন্ত হতে পারে। সাধারণে এত দাম দিয়ে কাপড় কিনবে না; কিনলেও বিক্রেতার তাতে লাভ কম। এইজন্য কতকগুলো মহাজন সস্তা দামে বিদেশী কলে তৈরী সূক্ষ্ম সুতোর পাড়হীন কাপড়ে নানা রকম নক্সার ছাপ মেরে, হাতে ঐ ছাপগুলো তুলে দেবার জন্যে শান্তিপুরে দিয়ে যায়। মেয়েরাই সাধারণতঃ অবসর সময়ে ঐ কাজ করেন। এজন্য তাদের কাপড় পিছু দু'টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত মজুরী দেওয়া হয়। শান্তিপুরের ধোপাও বাংলার মধ্যে সুবিখ্যাত। মহাজনেরা পরে ঐ নক্সা-তোলা কলের কোরা কাপড়গুলো শান্তিপুরের ধোপা দিয়ে বেশ ক'রে ধুইয়ে নেয়। ব্যস্,—তারপরেই সেটা 'শান্তিপুরে' শাড়ী হয়ে গেল! মহাজনেরা মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে পূজোর আগে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চতুর্গুণ লাভে এই 'শান্তিপুরে' কাপড় বিক্রী করে। ঐ কাপড় যে খোদ শান্তিপুর থেকেই তারা এনেছে একথা শপথ করে বলতেও তাদের বাধে না; সুতরাং ক্রেতা জোটে অনেক। বাইরের চাক্‌চিক্য দেখে লোকে ঐ কাপড় কেনে, কিন্তু প্রকৃত শান্তিপুরে কাপড়ের মতন তা' মোটেই টেকসই হয় না। এই কারণে শান্তিপুরে কাপড়ের উপর লোকের শ্রদ্ধা ক'মে যায়—ফলে প্রকৃত শান্তিপুরে কাপড় দু'দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাইরের চাক্‌চিক্যে ভুলে দেশের লোক কলের তৈরী কাপড় কেনে—তাঁতীর তৈরী কাপড় কেনে না; তার ফলে তাঁতী আজ বেকার।

শর্করা-শিল্প

কাপড়ের পরই আমাদের দেশে গুড়ের কথা বলা যেতে পারে। প্রতি বৎসর বাংলাদেশে আট লক্ষ টন গুড় তৈরী হয়। ওর সবটাই কুটীর-শিল্প-জাত। সাধারণতঃ খেজুরের রস বা আখ থেকে গুড় তৈরী হয়। তালের রস থেকেও পাটালী, মিছরী প্রভৃতি তৈরী হয়।
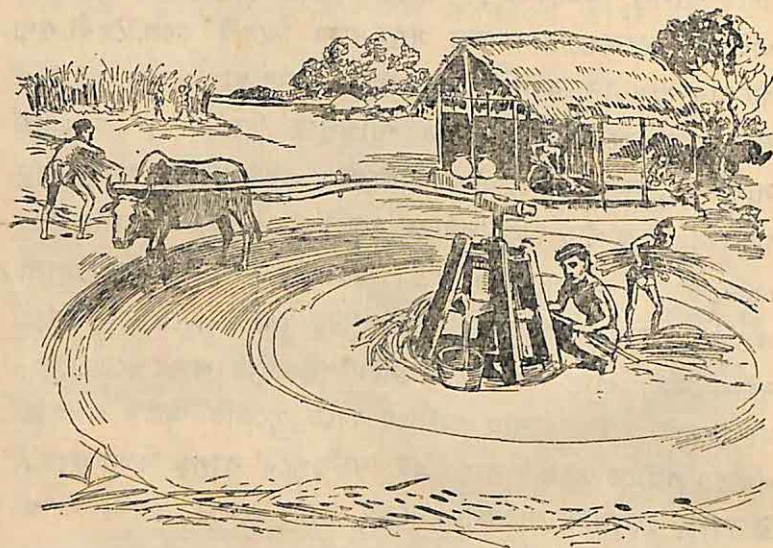
বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন—ঝোলা-গুড় থেকে জমির ভাল সার হয়। বাংলাদেশে ঝোলা-গুড়ের অভাব নেই, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আমাদের দেশের খুব কম শিল্পই পরিচালিত হয়ে থাকে। যশোর, নদীয়া ও মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলায় যথেষ্ট খেজুর গুড় উৎপন্ন হয়। যশোরের কোটচাঁদপুর গ্রামে আগে লক্ষাধিক মন চিনি প্রস্তুত হ'ত। দিনাজপুর জেলায় আখের চাষ হয় সব চাইতে বেশী।

ধাতু-শিল্প

যারা ধাতুর কাজ করেন তাদের মধ্যে তিনটে শ্রেণী-বিভাগ আছে। যাঁরা সোনা-রূপোর কাজ করেন তাঁদের 'স্যাকরা' বলে। যাঁরা পিতল, কাঁসা, ভরণ, তামা ইত্যাদির কাজ করেন তাঁদের 'কাঁসারী' বলে। আর যাঁরা লোহার কাজ করেন তাঁদের 'কামার' বলে।

বাংলাদেশে স্যাকরাদের অবস্থা অপরের তুলনায় বেশ ভালই।

কিন্তু কাঁসারী ও কামারের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। নবদ্বীপ, খাগড়া, মেমারী, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আজও পিতল-কাঁসার কাজ হয়ে থাকে; কিন্তু এ্যালুমিনিয়াম এবং জার্মান সিলভারের প্রচুর আমদানীতে এখন আর কাঁসারীদের আগের অবস্থা নেই।

কামারের অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। বিদেশী লোহার জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। দেশী কামার এখন কাজ না পেয়ে, চাকরীর

চেষ্টায় ঘুরছে। অথচ জনার্দ্দন, বিশ্বম্ভর, জন্মেজয় প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মকারগণ এদেশেই জন্মেছিলেন—এই দেশের কর্ম্মকারেরাই 'জাহানকোষা', 'দলমাদল' আর 'কালে খাঁ' কামান তৈরী করেছিলেন।

একদিন প্রথম বাংলা হরফ ঢালাইয়ের কাজে পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক একজন বাঙ্গালী কামার চার্লস্ উইলকিন্স সাহেবকে সাহায্য করেছিলেন। দেশের কারও কারও মতে পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা মনোহর বাংলাদেশে ছাপার কাজের উন্নতির গৌরবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাবী করতে পারেন।

রাজা সীতারাম তাঁর রাজধানী মামুদপুরে (যশোর) প্রায় তিনশ' ঘর কামার বসিয়েছিলেন। তারা কামান এবং যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করত। শুনলে আশ্চর্য্য মনে হবে—লোহার জন্যেও নাকি তাদের বিদেশে যেতে হ'ত না। মামুদপুরে তাদের সে বাসস্থান এখন শূন্য প'ড়ে আছে। আজও লোকে তাকে 'কামার-বাগ' ব'লে থাকে। যেখানে একদিন তিনশ' ঘর কামার ছিল, এখন সেখানে সমগ্র গ্রাম খুঁজলে হয়ত দু'তিন ঘর কামার পাওয়া যেতে পারে!

মৃৎশিল্প

মাটির কাজ যারা করে তাদের মধ্যেও দু'শ্রেণী আছে। যারা হাঁড়ী, কলসী, কুঁজো, মালসা প্রভৃতি তৈরী করে তাদের কুম্ভকার বা কুমোর বলে। যারা মাটি দিয়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়ে, কি নানা রকম পুতুল তৈরী করে, তাদের ভাস্কর বা পাল বলে। কোথাও কোথাও পালেরা ইট, টালি প্রভৃতিও তৈরী ক'রে থাকে। বেন্দা (যশোর) গ্রামের পালেরা বেশ সুন্দর সুন্দর টালি হাতে তৈরী ক'রে থাকে।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল দেশ-বিখ্যাত। কলকাতা মিউজিয়ামের অধিকাংশ মাটির মূর্ত্তিই কৃষ্ণনগরের পালেরা গ'ড়ে দিয়েছে।

সেখানকার পালেদের বাড়ীর একটি ছোট মেয়ের সামান্য একটা পুতুল তৈরীর মধ্যে যে শিল্প-নৈপুণ্য আছে, অন্য জায়গার বড়দের মধ্যেও তা' বিরল। তৈরী জিনিসের উপর যথাযথভাবে রং ফলানোয় এদের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা যায়। সেটা এদের একান্তই নিজস্ব।
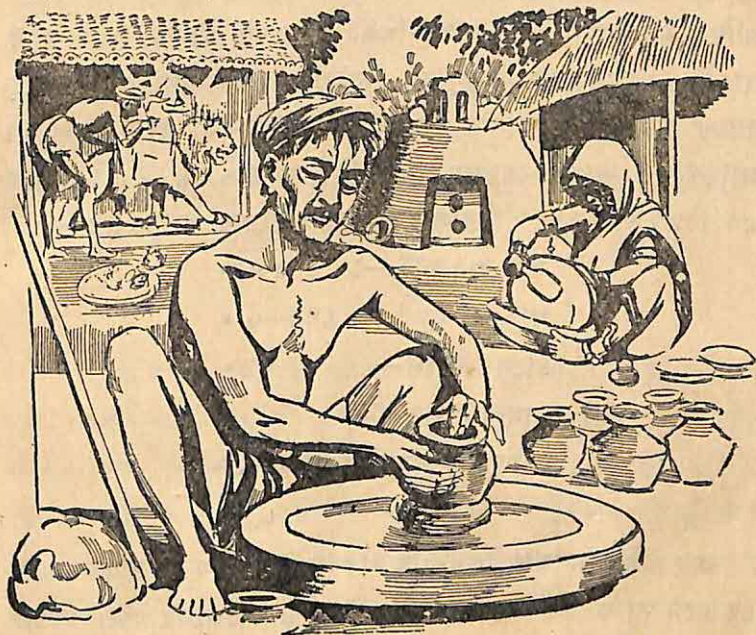
কেবল খেলনার পুতুল কেন, ফুলদান, ধূপদান, বাটি প্রভৃতিও পালেরা তৈরী করতে পারে। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের পালেরা এক রকম সুদৃশ্য সিগারেটের ছাই ঝাড়বার পাত্র (ash try) তৈরী করেছে। সেগুলো বাজারে বেশ চলেছে।

কাগজ-শিল্প

যারা কাগজ তৈরী করে তাদের 'কাগজী' বলে। সিরাজগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা, পাবনা প্রভৃতি স্থানে আগে অনেক কাগজ

নেকড়া বা তুলো থেকে তৈরী হ'ত। তার থেকেই এই হাতে তৈরী কাগজকে 'তুলট' কাগজ বলে। এখন তাদের ব্যবসায় আর চলে না। আজকাল মাত্র কোষ্ঠি লেখা বা দোকানের খাতাপত্র লেখার কাজে কোথাও কোথাও ঐ কাগজ ব্যবহৃত হয়। দেশের লোক এদিকে মন দিলে এই কাগজ-শিল্পটার যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হতে পারে। শোনা যায় বহুপূর্ব্বে বিক্রমপুরে আড়িয়ল গ্রামে সাড়ে সাতশ' ঘর লোক কাগজ প্রস্তুত ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করত। আড়িয়লের কাগজ এখনও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। এই কাগজ এক রিম তৈরী করতে নিম্নলিখিত মূল্যের দ্রব্যের প্রয়োজন :—

কাগজের ছাট—	১০ সের—	॥০
পাট—	১ সের—	৶০
চালের কলপ—		/১০
রাসায়নিক দ্রব্য—		
সোডা, চিনেমাটি ইত্যাদি—		৵০
		৸৵১০

এক রিম কাগজ তিন-চার টাকায় বিক্রী হয়। ছ'জন লোক একদিনে তা করতে পারে ; কিন্তু এই লাভ পাঁচজনের মধ্যে বিভক্ত হলে লাভ বেশী থাকে না। একজন কাগজীকে পনের কি কুড়ি টাকা মাসে দিলে, দুই মাসে সে কাগজ প্রস্তুত শিখিয়ে দিতে পারে। এদের কাগজ ঢাকা শক্তি ঔষধালয় ও সাধনা ঔষধালয়ে বিক্রী হয়। এই কাগজে ভাল প্যাকিং হতে পারে। বিলাতে হাতে-তৈরী কাগজে বইয়ের "রাজ-সংস্করণ" ছাপা হয়। তেমনি আমাদের দেশেও যদি হ'ত তা'হলে এই কাগজ-শিল্পটার উন্নতি হ'ত। পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ প্রভৃতির নিমন্ত্রণের চিঠি যদি আমরা নিয়ম ক'রে এই দেশী কাগজে ছাপি, তা'হলেও এর অনেক সাহায্য হতে পারে।

মোট কথা, দেশী কাপড়, দেশী কাগজ বা দেশী শিল্প-জাত যে কোনও জিনিসের উপর আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। বাংলায় যে ক'টি কাগজের কল হয়েছে, তাদের যত উন্নতিই হোক না কেন, আমাদের দুঃখের সহিত মনে রাখতে হবে যে, তার একটাও দেশী নয়!

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ তৈরী হয়। পিচবোর্ড কাগজ থেকে নানা রকমের বাক্স তৈরী, প্যাকিংএর কৌটা তৈরী, খাম তৈরী কুটীর-শিল্পের অন্তর্গত। এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করা যেতে পারে এবং এতে লাভও হবে।

দারু-শিল্প

কাঠের কাজের মধ্যেও দুটো শ্রেণী-বিভাগ আছে। একটা যারা মোটা কাজ করে—যেমন, নৌকো তৈরী, গরুর গাড়ীর চাকা তৈরী, লাঙ্গল তৈরী, তালগাছ থেকে 'ডোঙ্গা' তৈরী ইত্যাদি। আর একটা চেয়ার, টেবিল এবং নানাবিধ নক্সার কাজ। দেশের এই ছুঁতোর মিস্ত্রীর অবস্থা খুব শোচনীয় নয়। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে এদের কাজ যথেষ্ট আছে; কিন্তু কার্য্যতৎপর চীনা মিস্ত্রীদের সঙ্গে এরা এঁটে উঠতে পারছে না। আমাদের দেশের শিল্পীদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে—এরা একটু শ্রম-বিমুখ। সেজন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে আধুনিকের সঙ্গে তারা তাল রেখে চলতে পারে। যে 'ষাট বৈঠার' ছিপে মীরকাশেম একরাত্রে গোদাগারী থেকে মুঙ্গের গিয়েছিলেন, সেই ছিপ এই বাংলার ছুঁতোর মিস্ত্রীরাই তৈরী করত। কিছুদিন পূর্ব্বে বিক্রমপুরের মাটি খুঁড়ে যে সব সুন্দর সুন্দর কাঠের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে সেগুলো বাঙ্গালী শিল্পীরাই করেছিলেন—কিন্তু সে সব শিল্পী আজ কোথায়?

কলা বিভাগে যেমন রচনা আবৃত্তি বা সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা দেখা যায়, শিল্প বিভাগে তেমন কোন প্রতিযোগিতা নেই। প্রদর্শনীতে ক্বচিৎ কখনও শিল্প বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু বিশেষ কোনও শিল্পের জন্য পুরস্কার ঘোষণা বড় একটা
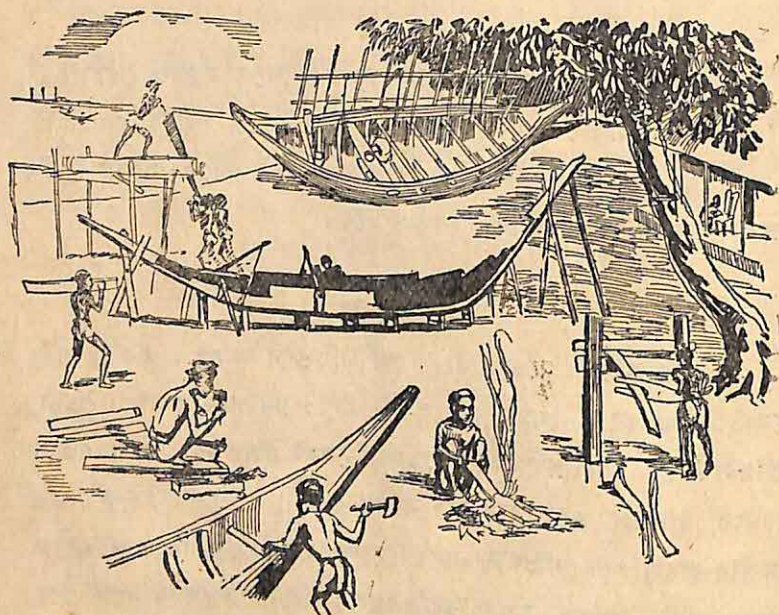
দেখা যায় না। দেশে যে কয়টি টেকনিক্যাল স্কুল আছে, তাদের কাজও গতানুগতিক ভাবে চলেছে, একথা বলা অসঙ্গত হবে না। শিল্প বিষয়ে প্রতিভার স্ফূরণ দেশবাসী সেখান থেকে আশা করতে পারে।

কারু-শিল্প

কারুকার্য্য বা নক্সার কাজে বাংলার কুটীর-শিল্প একদিন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পুরাতন কোন দরজা, আলমারী কি ব্রাকেট

প্রভৃতি দেখলেই তা বুঝা যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় কাঁথার ব্যবহার আজকাল উঠেই গেছে। কাঁথার উপর ফুল, ফল প্রভৃতি নক্সা আঁকায় বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা সুনাম অর্জ্জন করেছিল। বিবাহের আলপনা, শ্রী, সরা, কুলো, পিঁড়ি প্রভৃতির উপর সাধারণ ঘরের মেয়েরাও যে শিল্প-নৈপুণ্য দেখাতে পারত এখন তা' পারে না।

কাঠে, কাপড়ে, পাথরের গায়ে, তুলট কাগজে, বালিশের ওয়াড়ে, তালপাতার পুঁথির মলাটে, কাঁথায়, ক্ষীর ও নারকেলের মিঠাইতে, দেওয়াল-চিত্রে, বাটিতে, পালঙ্কে, পানের ডিবায়, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্দিরের ইটে, শীতল পাটীতে, হাতীর দাঁতের জিনিসে বাঙ্গালীর শত শত চারুকলার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

লবণ-শিল্প

মুসলমান আমল হতে ইংরেজ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুটীর-শিল্প হিসাবে, ও বড় বড় কারখানায় প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়ে বাংলার সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য প্রদেশে চালান হ'ত। বাংলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আজও লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডাররূপে বর্ত্তমান আছে; কিন্তু বর্ত্তমানে নিম্নবঙ্গের সেই সহস্র মলঙ্গীদের অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। কাঁথি, ডায়মণ্ডহারবার, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে আজও লবণ তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু অনতিকাল পরে বাংলা যদি তার 'সল্ট প্রোটেকসন্ এ্যাক্ট' থেকে বঞ্চিত হয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় লবণের জন্য এডেনের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তবে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কিছু থাকবে না।

চর্ম্ম-শিল্প

অন্যান্য শিল্পের ন্যায় চর্ম্ম-শিল্পও আমাদের দেশে বিশেষ এক-শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত আছে। এদের আমরা 'মুচি' বলি। এদের কাজ মরা বা মারা গরু-ছাগল প্রভৃতির চামড়া তুলে নিয়ে বেচে দেওয়া, চেয়ারে বেতের বুনানী দেওয়া এবং কখনও কখনও বিবাহ প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে বাজানো। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেশের লোকের রুচি 'বিলাতী' ভাবাপন্ন হয়ে গেছে। দেশী শানাই, বেহালা, ঢাক, কাঁসির আওয়াজ দেশের লোকের যেন আর ভাল লাগে না! তারা এখন 'ইংরাজী বাজনা'—বিদেশী 'ব্যাণ্ড-পার্টি' আনতে অপারগ হলে বিনা বাজনায় বিবাহ দিচ্ছেন! ফলে মুচিদের ঘর দিয়ে পড়ছে জল আর অবস্থা যাচ্ছে খারাপ হয়ে। জুতা সেলাই এবং জুতা তৈরীও এরা কখন কখন ক'রে থাকে।

বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশ থেকে কাঁচা চামড়া বিদেশে চালান যেত

এবং বিদেশ থেকে সেই চামড়া 'ট্যান্' হয়ে বিশগুণ মূল্যে এই দেশে ফিরে আসত। এতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হ'ত খুব বেশী। সেইজন্যে অনেক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় লোক বিদেশে গিয়ে এই চামড়া 'ট্যান্' করবার কৌশল শিখে এসে এখন দেশেই সেই কাজ করছেন।

চামড়ার কাজ খুব ভাল জানেন এমন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি বলেন,—মফঃস্বল থেকে 'ট্যান্' করবার জন্যে তাঁর কাছে যে সব চামড়া আসে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো খারাপ হয়ে যায়; তার কারণ আমাদের দেশের অনেকেই চামড়ার কাজ হেয় মনে করেন এবং যাঁরা সখ ক'রে বাঘ বা কুমীরের চামড়া ঘরে রাখতে চান, তাঁরা কাঁচা চামড়া কি ভাবে রক্ষা করতে হয় তা জানেন না। তার ফলে অনেক মূল্যবান্ এবং দুষ্প্রাপ্য চামড়াও ট্যান্ করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

ধরা যাক্ আমাদের বাড়ীর পোষা হরিণটা হঠাৎ একদিন ম'রে গেল। তার চামড়াটা আমরা কি ভাবে রাখতে পারি তাই দেখতে হবে। তিনি বলেন,—চামড়াটা খুব সতর্কতার সঙ্গে তুলে নিয়ে ঘণ্টা দুই-তিন একটা ঠাণ্ডা জায়গায় ফেলে রাখতে হবে। তারপর যথাসম্ভব ঐ চামড়া থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিতে হবে। পরে পরিষ্কার জলে চামড়াখানি ধুয়ে নিতে হবে—যেন রক্তের দাগ কি ধূলো-ময়লা না থাকে। শেষে একটা বাঁশের খুটার উপর ঐ চামড়াখানি রেখে জল ঝরিয়ে নিতে হবে।

কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ চামড়াখানি একটা মাদুরের বা পরিষ্কার সিমেণ্টের মেঝের উপর—ভিতরের দিকটা উপরে দিয়ে বেশ ক'রে ছড়িয়ে মেলে ধরতে হবে। ঐ চামড়ার উপরে (অর্থাৎ যে দিকে লোম নেই সেই ভিতরের দিকটায়) যথেষ্ট পরিমাণে লবণ ছড়িয়ে

দিয়ে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিলে দেখা যাবে, উপরে জল জমে' গেছে। ঐ জলটা ফেলে দিয়ে আবার ঐরূপ লবণ দিয়ে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে; তারপর যদি জল জমে তা'হলে আর একবার ঐরূপ লবণ দিতে হবে। যদি জল না জমে তা'হলে বুঝতে হবে চামড়া ঠিক হয়ে গেছে। তখন লোমের দিকটা উপরে থাকে এমনভাবে ভাঁজ ক'রে কয়েক মাসের মত ঐ চামড়া ঘরে রেখে দেওয়া যেতে পারে। সেই রকম অবস্থায়, যাঁরা ভাল ট্যানিং করেন তাঁহাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে, চামড়াখানির কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না এবং পরিষ্কার ট্যানিং হবে।

মৃৎ-শিল্প, দারু-শিল্প, কারু-শিল্প, রঞ্জন-শিল্প, আসন-শিল্প, বিদেশী শিল্প প্রভৃতির বিশদ বিবরণ আমরা 'জ্ঞান-ভারতী' গ্রন্থমালার "বাংলার শিল্প-সম্পদ" গ্রন্থে প্রকাশ করব। এগুলো ছাড়া এখানে আমরা আর কয়েকটি আনুষঙ্গিক শিল্পের উল্লেখ ক'রে ফ্যাক্টরী ও কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলব।

বিবিধ শিল্প

পাটি এবং বাঁশ, বেত ও সোলার জিনিস

সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভাল শীতলপাটি তৈরী হয়। এক সময়ে ফরিদপুরের সাতৈর নামক স্থানের 'পাত্তেরা' এমন মসৃণ পাটি তৈরী করতে পারত যে, তার উপর সাপ ছেড়ে দিলেও সাপ চলতে পারত না! তারা শীতলপাটির উপর যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা, দ্রৌপদীর অপমান, কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ইত্যাদি পৌরাণিক চিত্রও বুনতে পারত। শোনা যায়—একটা ছোট বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে তারা

ছ'হাত লম্বা এবং চার হাত চওড়া শীতলপাটি পূরে রেখে দিতে পারত! এদের বংশ ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ওখানকার বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, পাত্তেদের মেয়ের বিয়েতে—যে মেয়ে যত রকম পাটির 'যো' অর্থাৎ নক্সা জানত, তার তত কুড়ি টাকা দান হ'ত। জাপানী সস্তা পাটি এসে এদের ব্যবসায় নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে।

পাটি তৈরি

সোলার কাজে দেশের 'মালাকার' আজও জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করছে; কিন্তু তাদের কাজ ক'মে গেছে এবং যা তারা করছে তারও চাহিদা খুব কম। সোলার ফুল, সোলার পুতুল,পুতুল নাচের পুতুল, সোলা দিয়ে তৈরী ঠাকুরের গায়ের গহনা—এসব এখন আর

চলে না। বিয়ের মুকুট আর সোলার টুপী এই দুটোই আজকাল চলছে। হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর, নোয়াখালীর চৌমোহনী, যশোহরের মধ্যকুল এবং নদীয়ার কালীগঞ্জ প্রভৃতি কোন কোন স্থান থেকে প্রতি বৎসর বহু টাকার সোলার টুপী বিক্রী হয়ে থাকে—যদিও বিদেশে তার খুব কমই চালান যায়।
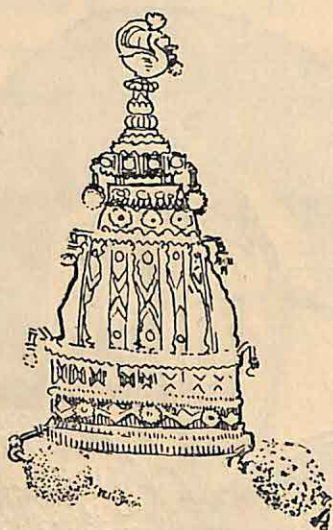
বিয়ের মুকুট

কুমিল্লার বেতের কাজ প্রসিদ্ধ। এখানে বেতের চেয়ার, বেতের ঝুড়ী, বেতের ঝাঁপি, পেটরা, সুটকেশ ইত্যাদি খুব সুন্দরভাবে তৈরী হয়।

দেশের মুচিরা চেয়ার, ইজি-চেয়ার এবং অন্যান্য 'ফার্‌নিচারে' বেত দিয়ে সুন্দর বুনানি দিয়ে থাকে।

ডোমেরা বাঁশের চাটাই, কুলো, ডোল, ডালা ইত্যাদি তৈরী করে; 'নলো' বা একরকম নল কেটে তার থেকে পাটি তৈরী

করে। 'হোগলার' কাজও এরা ক'রে থাকে। চাঁটগার একশ্রেণীর লোকে ছাতির বাট তৈরী ক'রে বিক্রী করে।

এসব ছাড়া, নারকেলের দড়ি, পাপোষ, ম্যাটিং, গদি, পাটের দড়ি, কম্বল, হুঁকো প্রভৃতি তৈরী, সাবান তৈরী, কাঠ ও কাগজের প্যাকিং বাক্স তৈরী, তামাকের চাষ, তেল উৎপাদন, মাছধরার জাল বুনান, বই বাঁধান, শাল-আলোয়ান রং ও রিপু করা ইত্যাদি বহুপ্রকার কুটীর-শিল্প আমাদের দেশে করা হয়ে থাকে; কিন্তু শিক্ষার অভাবে শিল্পীরা অনেক সময় গতানুগতিক ভাবেই চলে, অলসতা করে এবং
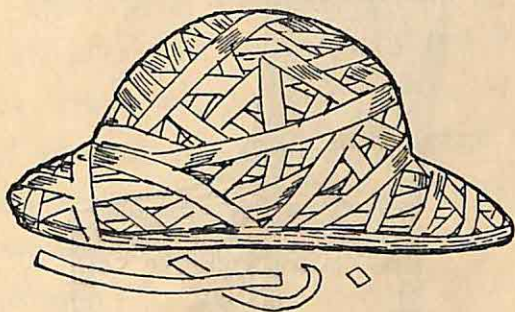
সোলার টুপী

দেশের লোকের সহানুভূতি পায় না। তার উপর বিদেশী চটকদার জিনিসের প্রচুর আমদানী এবং চাকরীর মোহ—এই সব ত আছেই।

যদি এই সব দেশীয় জিনিসের উপর একমাত্র দেশের লোকের প্রীতি থাকে—পরের সুসজ্জিত কোঠা-ঘরের চেয়ে নিজের পল্লী কুটীরকে যদি তাঁরা বড় ক'রে দেখেন, তা'হলে দেশে কুটীর-শিল্পের পুনরুত্থান সম্ভব হবে।

বাংলার কুটীর-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার বড় প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। এখন যদি আমরা সে প্রয়োজনে দৃক্‌পাত না করি, 'দেশী

জিনিস ছাড়া বিদেশী জিনিস কিনব না' ব'লে প্রতিজ্ঞা না করি, তা'হলে আমাদের সকলেরই অবস্থা হবে অতীব শোচনীয়।

হাঁস, মুরগী, মেষ, গরু প্রভৃতি পশু পালন ক'রে বা পুকুরে মাছ রক্ষা ক'রে বিক্রী করাও অর্থকরী কাজ। এই বিদ্যাকে কৃষির অন্তর্গত ক'রে ধরা হয়। বাড়ীতে পেঁপে, আনারস, আম প্রভৃতি
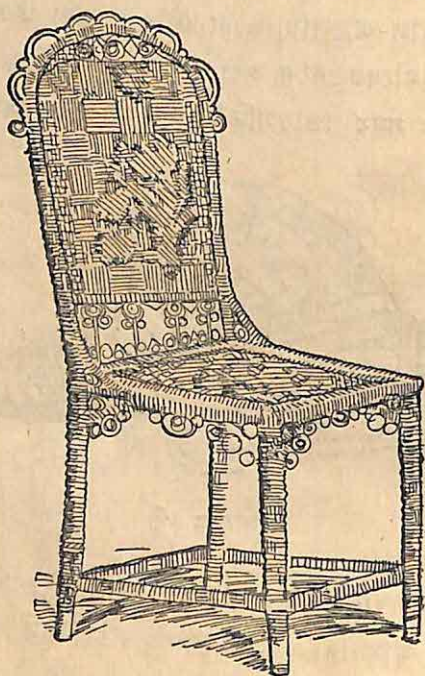
বেতের চেয়ার

ফল-ফুলারির চাষ ক'রেও দু'পয়সা আয় করা যায়। এগুলোকেও কৃষির মধ্যে ফেলা হয়। পেয়ারা থেকে জেলি তৈরী করাটা কিন্তু কৃষি-শিল্প নয়—ওটাকে কুটীর-শিল্প বলা যেতে পারে। ক্ষেত্রে উৎপন্ন কোনও শিল্পকে কৃষি এবং মানুষের হাতে উৎপন্ন শিল্পকেই সাধারণতঃ কুটীর-শিল্প বলা হয়ে থাকে।

মাছের ফাঁদ

মাছ যারা ধরে তাদের জেলে বা ধীবর বলা হয়। ধী অর্থাৎ বুদ্ধিশক্তিতে তারা যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জলের কত নীচে থাকে সব মাছ, কোন কোন মাছের গায়ে আবার তীক্ষ্ণ কাঁটা—অথচ নিষ্কৃতি নেই কারও! রুই-কাতলা থেকে চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত সকলকেই ধীবরের বুদ্ধির কাছে হার মানতে হবে।

বাস্তবিক মাছ ধরা একটা বড় রকমের বিদ্যা। এটাকে কৃষির মধ্যেই ধরা হয়। এইজন্য আমরা বলি, মাছের চাষ বা মাছের আবাদ। বাংলাদেশে এই কৃষির ক্রমোন্নতি চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রান্না ক'রে খাওয়া ভিন্ন মাছ থেকে মৎস্য-শিরীষ, মৎস্য-তেল, সার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। ডাক্তারেরা বলেন, জলবায়ু এবং আহার্য্য অনুসারে বাংলায় মাছ খাওয়ার প্রথা প্রচলিত না থাকলে স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা। মাছের মধ্যে যে 'ফস্‌ফরাস্‌' পাওয়া যায়, ওটা স্বাস্থ্যের—বিশেষতঃ চোখের পক্ষে খুব উপকারী।

অর্থোপার্জ্জনের দিক দিয়েও—মাছের চাষ বেশ লাভজনক। চীন, জাপান এবং কোরিয়া দেশে সোনালী রঙের এক রকম মাছ পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রেও এই মাছের চাষ হয়। সেখানে তারা এর থেকে প্রচুর অর্থ আয় করে।

মাছকে মোটামুটি ভাবে আমরা যেমন নোনা জলের, মিঠে জলের, বিলের এবং খানা গর্ত্তের এই কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, তেমনি মাছ ধরবার ফাঁদকেও কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে জাল, বাঁশ দিয়ে তৈরী ফাঁদ এবং লৌহ-নির্ম্মিত শস্ত্র ও বঁড়শি প্রধান। কিন্তু এ ছাড়া আরও কত রকমের মাছের ফাঁদ যে আমাদের দেশে বর্ত্তমান আছে, তা'

ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। মাছ ধরবার যন্ত্র-নির্ম্মাণ কুটীর-শিল্পের অন্তর্গত।

মাছের স্বভাব ও আকার অনুসারে বিভিন্ন জালের ব্যবহার হয়। ইলিশমাছ ধরবার যে জাল, পদ্মানদীর মাঝিরা তাকে বলে 'সাঙলে'। কূলপ্লাবী বর্ষায় পদ্মাবক্ষে অসীম সাহসী ধীবরেরা তাদের ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকোয় সাঙলে জালের দড়ি ধ'রে বসে থাকে। মাছ জালে পড়লেই তারা বুঝতে পারে, আর অমনি জাল টেনে তোলে। আর এক রকম জালেও ইলিশ মাছ ধরা হয়; তাকে বলে 'বেড়া-জাল'।
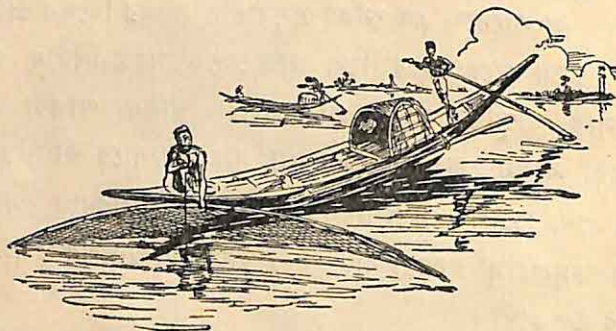
সাঙলে জাল

কাঠ-সোলা বা কাছিমের পিঠের হাড় এই জালের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। কাজেই জালের একটা দিক জলের উপর দিকে ভেসে থাকে। নদীর খানিকটা জায়গা ঘিরে আস্তে আস্তে এই জাল গুটিয়ে আনতে হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশমাছ ধরা পড়ে এই জালে।

রুই-কাতলা ধরবার অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। পুকুরের বা বিলের রুই-কাতলা অনেক সময় 'দড়া-জাল' দিয়ে ধরা হয়। এই দড়া-জাল বেড়া-জালেরই ছোট সংস্করণ। দড়া-জালে আটকে গেলে রুই-কাতলা খুব জোরে লাফ দিতে থাকে। এই জালের দড়ি ধ'রে টানতে হয় ব'লে কোন কোন অঞ্চলে একে 'টানা-জাল'ও বলে।

শেওলা বা ধানের জমির ভিতর বর্ষাকালে একরকম জাল পেতে রাখা হয়—তাকে বলে 'কৈ-জাল'। কৈ-মাছের কাণকো এই জালে আটকে গেলে তারা আর পালাতে পারে না।

'ক্ষ্যাপলা' বা ঝাঁপ-জাল দিয়ে প্রায় সব রকম ছোট মাছই ধরা যায়। এই জাল চক্রাকারে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়। জালের
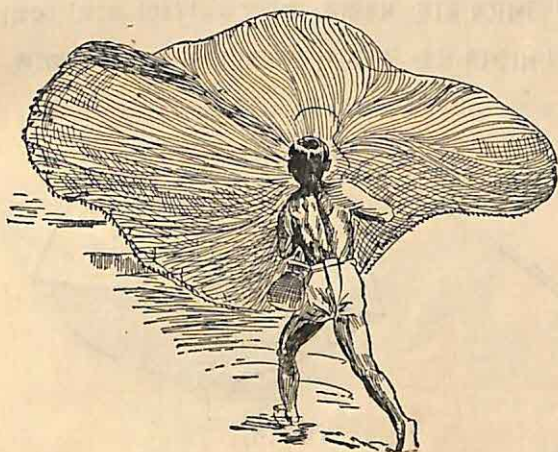
ক্ষ্যাপলা-জাল

নীচের দিকটায় থাকে লোহার কাঠি দেওয়া। কাজেই মাছ মাটিতে গিয়ে থাকলেও এই জাল তাকে টেনে তুলবেই।

আর এক রকম জাল আছে—তাকে 'ধর্ম্ম-জাল' বলে। ধর্ম্ম-জাল দৈবের উপর নির্ভর ক'রে পেতে ব'সে থাকতে হয়। খরসোল্লা বা খল্লা মাছ খুব চালাক। ঝাঁপ-জাল বা অন্য জালে তাদের ধরা বড় শক্ত। এই ধর্ম্ম-জালেই তাদের অকস্মাৎ টেনে ফেলতে হয় ডাঙ্গার উপর।

'ঘেরা-জাল' দিয়ে মাছ ধরা খুব সময়সাপেক্ষ। কোনও খাল, বিল কি মরা নদীর মধ্যে আগে থেকে প্রচুর ডালপালা দিয়ে রাখতে

হয়। মাছ গিয়ে ঐ ডালপালার মধ্যে আশ্রয় নেয়! তারপর ডালপালায় ঘেরা ঐ দুর্গটির চারদিকে জাল দিয়ে করতে হয় অবরোধ। ক্রমে ডালপালাগুলো তুলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাল আনতে হয় গুটিয়ে।

বর্ষাকালে আর এক উপায়ে রুইমাছ ধরা হয়। কোন কোন অঞ্চলে এই উপায়ে মাছ ধরবার জালকে 'মায়া-জাল' বলা হয়। খালের মুখে বাঁশের শক্ত কাঠি পুঁতে তার সঙ্গে এই জাল পেতে
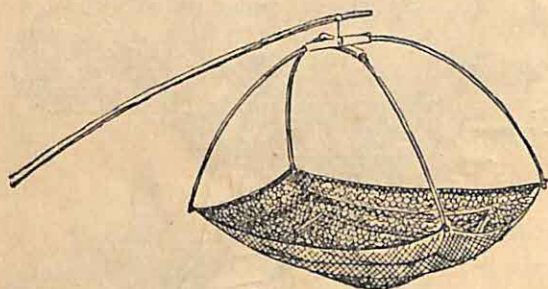
ধর্ম্ম-জাল

রাখা হয়। ঐ কাঠিতে মাথা ঠেকলেই রুইমাছ লাফ দেয় আর অমনি পড়ে গিয়ে সেই জালে!

নদীতে বা খালের মুখে বহুসংখ্যক লম্বা বাঁশ পুঁতে খুব উঁচুতে ব'সে থাকে একটি লোক 'ভ্যাসাল' বা 'ভ্যাসালি' জাল পেতে। বাঁশের মস্ত একটা বড় ত্রিভুজের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ জেলে আর সময় বুঝে আস্তে আস্তে নেমে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে পড়ে জাল। তাতে দেখা যায়, কত সাদা সাদা মাছ আটকে গেছে। মাথার উপর তখন চিল উড়তে থাকে— আর জেলে তাড়াতাড়ি তার জালে ঝাঁকানি দিয়ে মাছগুলোকে নিয়ে আসে নিজের কাছে।

এইসব জাল ছাড়াও খাটান জাল, পাশ-জাল, টাটোর জাল, কচাল, খুটনী এবং কোণা-জাল প্রভৃতি আরও নানা রকমের জাল আছে।

এইবার বাঁশ দিয়ে তৈরী যন্ত্রের কথা কিছু বলব। চিংড়ি ও বেলে প্রভৃতি মাছের স্বভাব এই যে, তারা কোন একটা কিছুর আশ্রয় ধ'রে চলাটাই পছন্দ করে। এজন্য দোয়াড়, বিত্তি প্রভৃতি যন্ত্র দিয়ে এদের ধরা হয়। 'খুনখুনে' ব'লে এক রকম বাঁশের তৈরী যন্ত্র আছে। তার উপরে ভাত ও চালের কুঁড়ো দিয়ে রাখা হয়। খাদ্যটা
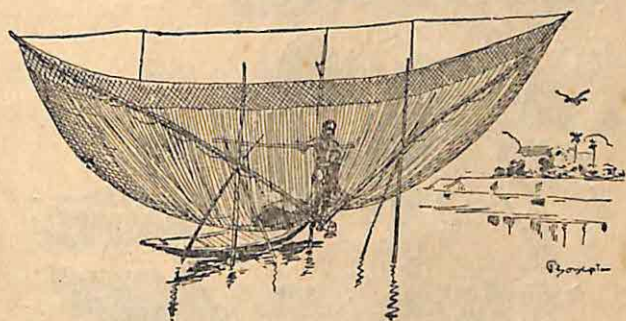
ভ্যাসাল-জাল

থাকে জলের ঠিক উপরে। পুঁটিমাছ ঐ ভাত খাবার জন্যে ঢুকে পড়ে ঐ যন্ত্রের মধ্যে তারপর আর বেরোতে পারে না।

অল্প জলের ক্ষুদ্র মাছ ধরা হয় 'ওছা' বা 'চালনী' দিয়ে। তিন-খানা ছোট বাঁশ দিয়ে একটা ত্রিভুজের মত ক'রে ওছা তৈরী করা হয়। ভিতরটায় জাল বা সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে বুনানি করা থাকে। ওটাকে টেনে নেওয়ার জন্যে ঐ ত্রিভুজের মাঝখান দিয়ে একটা বাঁশের লাঠি বেঁধে দেওয়া হয়।

'বাণ' প্রভৃতি মাছ অনেক সময় আত্মগোপন ক'রে থাকতে

ভালবাসে। এজন্য কখনও কখনও তাদের বাঁশের চোঙ্গ পেতে ধরা হয়।

'চালনী' যন্ত্রের বৃহৎ সংস্করণ হচ্ছে 'সাগরা'। নদীর পার বেশ ঢালু ক'রে কেটে নিয়ে সেখানে সাগরা পেতে রাখা হয়। সাগরার মধ্যে শেওড়া, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের ডাল দিয়ে রাখাই নিয়ম; প্রত্যহ সকালে সাগরা টেনে তুললে তার মধ্যে কত রকম মাছ পাওয়া যায়।

বাঁশের তৈরী রকমারি মাছের ফাঁদ

মাছকে তাড়া ক'রে আটকে ফেলে টেনে ধরবার যন্ত্র হচ্ছে 'পোলো'। বাঁশের কাঠি দিয়ে পোলো তৈরী হয়। কোন কোন অঞ্চলে মাঘ-ফাল্গুন মাসের দিকে বিলের জল ক'মে গেলে সেখানে পোলো পড়ে। সে এক দেখবার মত ব্যাপার! পূর্ব্ব থেকে হাটে কেরোসিনের টিন পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অমুক দিন অমুক বিলে পোলো পড়বে। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখা যায়, প্রায় তিন্-চারশ' লোক পোলো নিয়ে এসে উপস্থিত। তারপর লাইন ক'রে তারা

নেমে গিয়ে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পোলো চালায়। পোলোতে শোল, কই, ফলুই, বোয়াল প্রভৃতি বহুবিধ মাছ ধরা পড়ে।
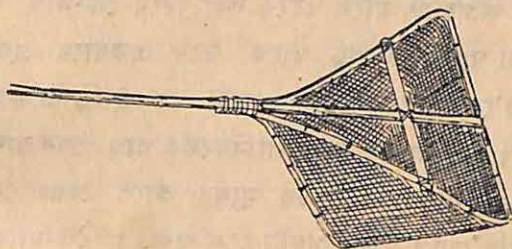
ওছা

কৈ, মাগুর, খলসে প্রভৃতি মাছের স্বভাবই এই যে, তারা নতুন জল পেলেই লাফিয়ে ডাঙ্গায় উঠে। এজন্য কোন কোন পল্লী অঞ্চলে

পোলো

দেখা যায়, আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিধারার পর রান্নাঘরের উননের মধ্যে কি গোয়ালঘরের মধ্যে কত কৈ-মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে!

'চার দিয়ে, বঁড়শি ফেলে এবং ট্যাটা, কোচ প্রভৃতি দিয়েও

মাছ ধরা হয়। মাছের আকার অনুসারে বঁড়শিরও বহু প্রকার-ভেদ আছে।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে 'হেড়ে কল' দিয়ে কৈ-মাছ ধরা হয়। যে পুকুরে বা গর্ত্তে কৈ-মাছ থাকে, তার একধারে একটা ছোট নালামত ক'রে তার গোড়ায় একটা বড় হাঁড়ি বা কলসী পুঁতে রাখতে হয়। ঐ নালার উপর পানিফলের গাছ শেকড়সহ ছড়িয়ে রাখতে দেখা যায়। হাঁড়িটির মুখের কাছে দেয় মেথি এবং চালভাজার গুঁড়ো। তার গন্ধটা বেশ সুন্দর। কৈ-মাছেরা ঐ গন্ধ পেয়ে নালা বেয়ে উঠতে থাকে এবং শেষটায় প'ড়ে যায় ঐ হাঁড়ির মধ্যে—আর উঠতে পারে না।

কচুরীপানা টেনেও কৈ-মাছ ধরা যায়। কচুরীপানার শেকড়ের সাথে কৈ-মাছের কাণকো আটকে গেলে সে আর পালাতে পারে না।

সমুদ্রের খুব নিকটে—ডায়মণ্ড-হারবার কি ক্যানিং অঞ্চলে জোয়ারের সময় জমি ঘিরে রাখা হয়। জোয়ার স'রে গেলে হাত দিয়েই তখন কতজনে সেই মাঠের জমিতে মাছ ধরে।

হুঁকো-কলকে প্রভৃতির কথা

ধূমপানের কৌশলটা পর্ত্তুগীজেরাই প্রথমে আমাদের দেশে আমদানী করে।

সম্রাট্ আকবর তখন দিল্লীশ্বর। দুইজন পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজক এসে সম্রাট্কে অভিবাদন জানাল। সম্রাট্ বললেন—'নতুন কি এনেছ দেখাও।' সম্রাটের একথা বলার কারণ এই যে, তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, বিদেশীরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে সম্রাট্কে ওদের দেশের যাহোক্ একটা নতুন কিছু উপঢৌকন দিত।

পর্ত্তুগীজদের একজন তার মাটির তৈরী পাইপে আগুন দিয়ে ধূম উদ্গিরণ করতে আরম্ভ করল।

সম্রাট্ সন্তুষ্ট হলেন না, বললেন—'এই তোমার নতুন জিনিস? এর চাইতে ভারতের বাজীকর ঢের ঢের বেশী কসরৎ দেখাতে জানে। তুমি ত মাত্র ধূম দেখাচ্ছ—তারা আগুন পর্য্যন্ত বের ক'রে দেখাতে পারে।'

পর্ত্তুগীজ তখন সবিনয়ে নিবেদন করল—'জাহাঁপনা! আমি কোনও যাদুবিদ্যা দেখাইনি, এটা একটা নতুন জিনিস। এই ধূম পান করতে বেশ আরাম লাগবে এবং শরীরটাও বেশ চাঙ্গা মনে হবে।'

এই ব'লে পর্ত্তুগীজ তখন তার তামাক এবং আসবাবপত্র বের ক'রে দেখাল। সম্রাট্ ত মহাখুশী। তখনই তিনি নিজে ধূমপান করতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু কি জানি—ওটা বিষাক্ত কিনা তার ঠিক কি! তখনই হাকিম আবদুল ফতে গিলানীকে ডাকান হ'ল। তিনি পরীক্ষা ক'রে বললেন—'না, জিনিসটা ভালই।'

আকবর তামাকে একটান দিতেই এল কাশি। প্রথম প্রথম তামাক খেতে গেলে যা হয় আর কি! তখনই যত হাকিমের দলকে তলব করা হ'ল। সম্রাটের হুকুম—এই জিনিসটাকে বেশ মোলায়েম ক'রে দিতে হবে। অগুরু, কস্তুরী এবং আরও কত কি মিশিয়ে তামাক তৈরী হ'ল।

তারপর কতদিন ধ'রে নানারূপ পরীক্ষার পর আবিষ্কার হ'ল কলকে, লম্বা নলচে এবং জলপূর্ণ হুঁকো।

গুড়ুৎ-গুড়ুৎ শব্দে একটা তন্দ্রালস ভাব আনবার জন্যেই যে কেবল হুঁকোয় জল ব্যবহার আরম্ভ হ'ল তা' নয়, ঐ জলের ভিতর দিয়ে ধুঁয়ো আসবার ফলে তামাকের কড়া ভাবটা কেটে বেশ একটা আমেজপূর্ণ স্নিগ্ধ সুগন্ধও বেরিয়ে এল।

তা'হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইউরোপের কাছ থেকে আমরা ধুমপান শিখেছি, কিন্তু হুঁকো কলকের আবিষ্কার আমাদের নিজস্ব। ইংলণ্ডে হুঁকো এবং গড়গড়ার আমদানী ভারতের দেখাদেখিই একদিন হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় একশ' বছর আগেও ইউরোপে এই হুঁকোয় ধূমপান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, তখন ইংলণ্ডের মেয়েরা পর্য্যন্ত হুঁকো টানত! আর ভারতের সম্রাজ্ঞীরা ত তখন দিনরাত আলবোলা নিয়েই থাকতেন ব'লে শোনা যায়। বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে সঙ্গে তখন 'হুকা-বরদার' ফিরত। রাজপুতেরাও খুব গড়গড়ার ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অম্বর রাজ্যে এখনও ভাল তামাক উৎপন্ন হয়, তাকে 'অম্বরী তামাক'বলে।

ধূমপানের এখন যা কিছু দরকার সবই আমাদের দেশে তৈরী হয়; সুতরাং ওটাকে এখন 'স্বদেশী' জিনিস ব'লে ধরা যেতে পারে। তামাক আমাদের দেশেই হয়, কলকে কুমোরেরা তৈরী করে, নৈচেও মিস্ত্রীরা ক'রে দেয়। হুঁকোর প্রধান সরঞ্জাম নারকেলের খোল বাংলাদেশেরই আবিষ্কার; আর হুঁকোর প্রচলন একমাত্র আমাদের বাংলাদেশেই দেখা যায়। খুলনা জেলার দৌলতপুর ও ফুলতলায় নৈচে বা হুঁকোর ডাট তৈরী হয়। কুমিল্লার হুঁকো বিখ্যাত। নারকেলের খোলকে এরা চমৎকার মসৃণ করতে পারে। সেখান থেকে অনেক হুঁকো অন্যান্য জেলায় চালান যায়।

বাংলার বাইরে চলে গড়গড়া। কাবুলী ও পশ্চিমারা একটা গড়গড়ায় আবার দুই-তিনটে নল বসিয়েও টানে!

সৈন্য-বিভাগের লোকেরা দেখলে গড়গড়া বা হুঁকো টানতে গেলে আর যুদ্ধ করা যায় না; তখন থেকে তারা ধরল সিগারেট। তারপর এল চুরুট এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় জিনিসে তৈরী হ'ল বিড়ি।

শালপাতা দিয়ে বিড়ি তৈরী ক'রে আমাদের দেশে অনেকে জীবিকা সংগ্রহ করে। কতকগুলো সিগারেট আছে যা একেবারেই বিদেশী। স্বদেশী যুগে এগুলোকে বর্জ্জন করা হয়েছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশে হুঁকো সামাজিকতার একটা অঙ্গ ছিল। কেউ কোনও নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করলে সমাজ তার 'হুঁকো বন্ধ' করত।

আমাদের দেশে সাহেবেরা এবং সাহেব-ভাবাপন্ন বাঙ্গালীরা 'পাইপ' টানেন। এই পাইপ কিন্তু একদিনের আবিষ্কার নয়। অনেক রকমারির ভিতর দিয়ে তবে বর্ত্তমান পাইপের উদ্ভব হয়েছে।

ইংলণ্ডে তু'শ' বছরের উপরে তামাক প্রচলিত হয়েছে। প্রথমে কিন্তু নস্যিরই প্রচলন ছিল। মেয়েরা পর্য্যন্ত তখন নস্য ব্যবহার করত। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি কাউপার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ—

"Says the pipe to the snuff-box, I cannot understand
What the ladies and gentlemen see in your face,
That you are in fashion all over the land,
And I am so much fallen into disgrace !"

[পাইপ নস্যির ডিবেকে বলছে, "আমি বুঝি না, ভদ্র মহিলা এবং মহোদয়রা তোমার মধ্যে এমন কি খুঁজে পান যে, তুমিই সর্ব্বত্র 'ফ্যাশন' হয়ে আছ, আর আমি সইছি এত অপমান !"]

এখন কিন্তু হয়েছে ঠিক উল্টো। এখন মেয়েরাও সেখানে পাইপ এবং সিগারেট টানছে, আর নস্যির কথা ভুলেই গেছে বললে হয় ! অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বৃষ্টল সহরে প্রায় বারটা নস্য-তৈরীর কারখানা ছিল। উপরের কবিতা থেকেই বোঝা যায় ওই সময়ে পাইপ-যোগে ধূমপান করা হ'ত; কিন্তু ভদ্র-সমাজে তা' চলত না।

স্যর্ রবার্ট পয়ন্ট্‌জ্‌এর উদ্যানে স্যর্ ওয়াল্‌টার র‍্যালে সর্ব্বপ্রথম ধূমপান করেন পাইপে!

কথিত আছে, এই সময়ে তাঁর চাকর প্রভুর বিপদ্ বুঝে তাড়াতাড়ি এক বালতি জল ঢেলে দেয় তাঁর মাথায়!

এর পর থেকেই পাইপ-যোগে ধূমপান ভয়ানক ভাবে বাধা পায়। কেউ কেউ এই ধূমপানের বিরুদ্ধে বই লিখলেন, কেউ আঁকলেন কার্টুন ছবি! কিন্তু কিছুতেই বাধা মানল না। এর পর মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ওয়াল্‌নাট্ নামক ফলের আঁঠিতে ছিদ্র ক'রে তাতে ফাঁপা কাঠি লাগিয়ে ধূমপান করতেন। ধনবানেরা মজলিশে ধূমপান করতেন রূপোর কাঠিতে। ঐ পাইপ একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে ফিরত। বলা বাহুল্য, এই সময়ে রূপোর ওজনে বিক্রী হ'ত তামাক!

আগেকার দিনে লোকে সমস্ত বিষয়েই কারুকার্য্য ও জটিলতা পছন্দ করতেন। প্রথম যুগের পাইপ ছিল খুব জটিল—তারপর snake অর্থাৎ সাপের প্যাঁচ, তারপর হ'ল 'হার্ট-ইন-হ্যাণ্ড' এবং সর্ব্বশেষে হ'ল আধুনিক ঝরঝরে পাইপ।

টোকা ও ছাতার বাট

কুটীর-শিল্প হিসাবে হুঁকো-কলকের সরঞ্জাম বা বিড়ি তৈরী ক'রে আমাদের দেশে যেমন অনেকে জীবিকা সংগ্রহ ক'রে থাকে, ছাতার কাজ ক'রেও তেমনি অনেকে সংসার চালায়।

ছাতার নানা রকম বাট আজকাল আমাদের দেশেই তৈরী হতে পারে। সরু বাঁশ বা বেত আগুনের তাপে বাঁকিয়ে নিয়ে বাট তৈরী হয়। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় অনেকে ছাতির বাট তৈরী করে।

ছাতির প্রচলন হওয়ার আগে আমাদের দেশে তালপাতার বড় বড় 'মাথাল' ব্যবহৃত হ'ত। এখনও কাশীধামে দশাশ্বমেধ কি মণিকর্ণিকার ঘাটে এই সব তালপাতার ছাতি দেখতে পাওয়া যায়। এর ছোট সংস্করণ হচ্ছে 'টোকা'। টোকা মাথায় দিয়ে চাষীরা মাঠে যায়। মাথাল বা টোকার সব চেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে ওগুলোকে বন্ধ করা যায় না।

তা' না গেলেও এই টোকা বা মাথাল চাষীদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগে। টোকা ছোট, বড়, লম্বা অনেক রকমের আছে। গোলপাতা এবং তালপাতা দিয়ে তৈরী বড় টোকাকে কোন কোন অঞ্চলে মাথাল বলে। বাঁশ দিয়ে তৈরী অপেক্ষাকৃত ছোট ও মাঝখানটায় উঁচু মাথালকে পশ্চিম বাংলায় টোকা বলা হয়। জলের 'সেচনি' আকারে তালপাতার লম্বা টোকাও তৈরী হয়। পিঠ অবধি ঢাকা পড়ে এই টোকাতে। হোগলা দিয়েও এই টোকা তৈরী হতে দেখা যায়।

মিষ্টান্নের মিষ্টকথা

বিবিধ মিষ্টান্ন তৈরী আমাদের দেশের একটা বড় শিল্প। এই শিল্পের কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু অবনতিও এর কম হয়নি। কতকগুলো খাবার এখন লোকে তৈরী করতে ভুলেই যাচ্ছে।

উন্নতি যা হয়েছে সেটা খাবারের রূপান্তর মাত্র। যেমন রসগোল্লা হয়েছে বৃহৎ আকারে 'রাজভোগ' আর পানতোয়া হয়েছে 'লেডিকেনি'। আম-সন্দেশ, রসমালাই প্রভৃতিকেও নতুনতম মিষ্টান্ন বলা যেতে পারে।

এখানে কয়েকটি মিষ্টান্নের বিবরণ দেওয়া হ'ল ঃ

স্যাণ্ডউইচ—জিনিসটা বিদেশী হলেও সম্পূর্ণ দেশীয় মাল-মশলায় ওটা তৈরী করা যায়। তা'ছাড়া পরের ভাল জিনিস অনুকরণ করা

পণ্ডিতেরা যখন অন্যায় ব'লে মনে করেন না তখন স্যাণ্ডউইচকেই বা আমরা গ্রহণ করব না কেন ? আসলে জিনিসটা ত আর খারাপ নয়—কি বল তোমরা ?

স্যাণ্ডউইচ নামটা কি ক'রে হ'ল সেও এক মজার ব্যাপার !

প্রায় দেড়শ' বছর আগের কথা। আর্ল ছিলেন গবর্ণমেণ্টের একজন সভ্য। কিন্তু তাসখেলায় ছিল তাঁর ভয়ানক ঝোঁক। একদিন অনেকক্ষণ ধ'রে তাস খেলতে খেলতে তাঁর ভয়ানক ক্ষিদে পেল। তিনি চাকরকে রুটির ফালি (শ্লাইচ) আর মাংস আনতে বললেন। চাকর দোকান থেকে খাবার নিয়ে এল। কিন্তু হাত দিয়ে মাংস খেতে গেলে ত হাতে ঝোল লেগে যাবে—তাতে তাসখেলা হবে মুস্কিল। তাঁর ইচ্ছা তিনি তাসও খেলবেন আবার খাবেনও। চাকর তাই বুদ্ধি ক'রে দু'খানা রুটির ফালির মাঝখানে এমনভাবে মাংস রেখে দিল যে, খাবার সময় ঐ মাংস কিছুমাত্র হাতে না জড়িয়ে যায়। এই ভদ্রলোকের পুরো নামটা ছিল—আর্ল অব স্যাণ্ডউইচ। তাঁর নাম থেকে ঐ খাবারের নাম হয়েছে—স্যাণ্ডউইচ।

লেডিকেনি—লেডিকেনি সম্পূর্ণ আমাদের দেশীয় খাবার। পানতোয়ারই একটা রূপান্তর এই লেডিকেনি ; নামটা কিন্তু বিদেশী। দেশী খাবার কি ক'রে এই বিদেশী নাম পেল তা বলা শক্ত। কেউ কেউ অনুমান করেন—লেডি ক্যানিং-এর নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে।

সরপুরিয়া—কৃষ্ণনগরের সরভাজা-সরপুরিয়ার নাম কে না শুনেছে ? ক্ষীর, মিছরীর গুঁড়ো, ছানা, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী এই খাবার। তৈরী করার পর ছুরি দিয়ে বরফীর মত চাক চাক ক'রে রাখা হয় এগুলোকে। এই খাবারের মধ্যে সর 'পুরিয়া' দিতে হয় ব'লে তার থেকেই সম্ভবতঃ 'সরপুরিয়া' নাম হয়ে গেছে।

নিখুঁতি—শান্তিপুরের নিখুঁতি বিখ্যাত। ছানার জিলিপির মত (অথচ লম্বা) প্যাঁচ তৈরী ক'রে সেগুলোর খণ্ড দিয়ে পক্কান্ন বা দরবেশের মত ক'রে তৈরী করা হয় নিখুঁতি।

শোনা যায় শান্তিপুরের কোন ময়রার মেয়ের নাম ছিল নিখুঁতি। হয়ত মেয়েটির চেহারায় কোন খুঁত অর্থাৎ ত্রুটি ছিল না। সে ছিল পরমা সুন্দরী। একবার কতকগুলো ভাঙ্গা ছানার জিলিপির সঙ্গে সে আরও কিছু মিশিয়ে খেলার ছলেই গোল গোল খাবার তৈরী করে।

সেই খাবার খেয়ে এক বুড়োর এতই ভাল লাগে যে, তিনি ছুটে আসেন ঐ ময়রার বাড়ীতে; এসে বলেন—'কে করেছে রে এই খাবার?' ময়রা বলে—'ওগুলো করেছে নিখুঁতি।'

বুড়ো ভাবেন, বুঝি এই খাবারের নামই নিখুঁতি। তিনি বলেন—'আমি আরও নিখুঁতি চাই—কলকাতায় আমার জামাইয়ের বাসায় পাঠাব।'

এইভাবে কতজনে দু'সের পাঁচ সের 'নিখুঁতি'র অর্ডার দেয়। তারপর থেকে ঐ খাবারটারই নাম হয়ে গেল নিখুঁতি—স্যাণ্ডউইচ সাহেবের নাম অনুসারে যেমন হয়েছে স্যাণ্ডউইচ।

উপরে যে সব খাবারের নাম করা গেল ওগুলো তৈরী করতে কিন্তু কৌশল লাগে যথেষ্ট। যে কোনও লোক ওগুলো তৈরী করতে পারবে না। এই জন্যই কোন কোন জায়গায় কোন কোন জিনিস বিখ্যাত হয়। এসব ভাল ভাল খাবার ত দূরের কথা—সামান্য 'কদমা' বা চিনির খাবার পর্য্যন্ত সব জায়গায় সমান তৈরী করতে পারে না। দীনেশ সেন মহাশয় তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' নামক বইতে চিনি দিয়ে তৈরী মানুষের সমান উঁচু একটা রথের উল্লেখ করেছেন। আজ-কাল ওসব জিনিস আর কেউ তৈরী করতে পারে ব'লে মনে হয় না।
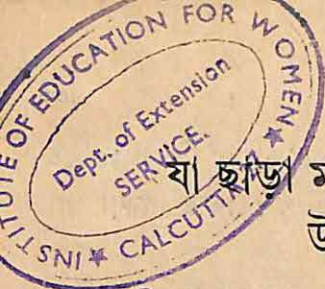
যা ছাড়া মানুষের সভ্যতা গ'ড়ে উঠতে পারেনি

আদিম যুগে মানুষের বেঁচে থাকাই ছিল একটা সমস্যার বিষয়। মানুষের হিংস্র পশুদের মত শিং নেই, দাঁত নেই, নখও নেই—অথচ মানুষকে বেঁচে থাকতে হ'ত তখন বন্য মহিষ, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে। শুধু বেঁচে থাকাই নয়, শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল—মানুষই প্রভুত্ব করছে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী শক্তিমান এই সব হিংস্র পশুর উপর!

মানুষ বুদ্ধিবলে এদের হাত থেকে কেবল পালাবারই চেষ্টা করেনি,—তা' যদি করত তা'হলে মানুষকে আজ খরগোস বা হরিণের মত পালিয়ে পালিয়েই আত্মরক্ষা করতে হ'ত। মানুষ চেষ্টা করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে, কিন্তু কি নিয়ে তারা দাঁড়াবে?—মানুষ হাতের কাছে পেল পাথর, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াল! মানুষ পাথর ঘসে তৈরী করল তার আত্মরক্ষার অস্ত্র। কিন্তু 'প্রস্তর যুগে' মানুষ আত্মরক্ষাই করেছে—আধিপত্যের কথা বা সভ্যতার কথা ভাবতেও পারেনি তখনও।

তারপর আবিষ্কৃত হ'ল লৌহ। মানুষ লৌহ দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করল,—সে বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। হিংস্র প্রাণী ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করল। মস্তিষ্ক পরিচালনা ক'রে মানুষ আবিষ্কার করল লাঙ্গল—তারপর মানুষের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল, মানুষ নিজের কথা ছেড়ে পরের কথা, দেশের কথা ভাবতে শিখল। সেই দিন হ'ল মনুষ্য-সভ্যতার সুপ্রভাত। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই প্রভাত-সূর্য্য-রশ্মির উদ্বোধন করেছিল অন্ধকার তমিস্রাপুরী থেকে আগত লৌহ।

মনে রাখতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্য লৌহ হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেনি—প্রস্তর যুগেই লৌহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু মানুষের কুসংস্কার রেখেছিল লৌহকে অস্পৃশ্য করে! তারপর হাজার হাজার বছর অতীত হয়ে গেল, মানুষের ধারণা গেল উল্টে—এখন লোকে লৌহকে বন্ধু ব'লেই জানে।

জাহাজ, ইঞ্জিন, ছুরি, কাঁচি, মোটরকার যা কিছু আমরা অতি প্রয়োজনীয় ব'লে মেনে নিয়েছি তার সবগুলোর মূল উৎপত্তিস্থল মাটির নীচে লৌহের আকারে। দা, কোদাল, কুড়ুল বা সাইকেলের লোহা মাটির নীচে থেকে আসে ব'লে মনে ঠিক করা হবে না যে, মাটির নীচে পাথরের চাঙ্গরার মত লোহার চাঙ্গড়া থাকে! আর আর পার্থিব জিনিসের সঙ্গে মিশে আছে লোহা—মানুষকে তার উদ্ধার সাধন করতে হয়েছে।

পার্থিব জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত এই লৌহকে Iron Ores বলে। এই Iron ore আবার বিভিন্ন প্রকারের আছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির প্রাচুর্য্য কিছু কম নেই মাটির নীচে। এমন কি সমগ্র পৃথিবীতে যে মাটি আছে তার উনিশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে লোহা। কিন্তু ore আমাদের দেশে কতিপয় জেলায় মাত্র আছে—সুতরাং যে কোনও মাটি খুঁড়লেই লোহা পাওয়া যাবে না। Ore থেকে লোহা তুলে বড় বড় চুল্লী বা furnace-এ ওটা গলিয়ে (smelting ক'রে) নিতে হয়; কিন্তু এই smelting-এর জন্য চাই প্রচুর কয়লা (coal)। কাজেই যে জায়গায় লোহা আর কয়লা দুই-ই পাওয়া যায় লৌহ তুলবার সেই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা। মহীশূর, আসানসোল এবং বিহার প্রদেশের জামসেদপুর প্রভৃতি জায়গা এইজন্য কলকারখানায় ছেয়ে গেছে।

খনি থেকে কয়লা বা লৌহ উত্তোলন শিল্পের বিষয় নয়; কিন্তু

লৌহ থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরী কুটীর-শিল্পের অন্তর্গত। বাংলার কামারেরা আজও এই শিল্প নিয়ে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করছে। এখানে লৌহ এবং ইস্পাতের মধ্যে পার্থক্যটা জানা দরকার। লোহাকে আঘাত করলে সহজে ভাঙ্গে, কিন্তু ইস্পাত বেঁকে যায়; লোহায় সহজে মরচে ধরে, ইস্পাত দিয়ে যেমন পাত (sheet) তৈরী করা যায় লোহা দিয়ে তা' যায় না। ইস্পাতের দামও লোহার চেয়ে ঢের বেশী।

Pig ironকে পরিশুদ্ধ ক'রে steel তৈরী করা হয়। লোহাকে ইস্পাত করতে হলে কারবন (carbon) নামক পদার্থের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ ইস্পাতের মধ্যেও রকমারি আছে এবং বিভিন্ন ইস্পাত বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন রেলের গাড়ীর চাকা সে ইস্পাত দিয়ে হবে না যে ইস্পাত দিয়ে তার তৈরী হয়। দাঁতওয়ালা চাকা প্রভৃতি আবার Pig iron দিয়েই (cold blast) তৈরী হয়।

তৈরীর তারতম্য অনুসারে কোনও ইস্পাত শক্ত, নরম বা ভঙ্গুর হয়। খুব উত্তপ্ত ইস্পাত হঠাৎ জলের মধ্যে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করলে শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর ইস্পাত তৈরী হবে। যদি ওটাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা যায় তা'হলে ওটা নরম ও টেকসই হবে। মনে রাখতে হবে carbon কম বেশী হওয়ার ফলে ইস্পাত শক্ত বা নরম হয়।

বর্ত্তমান যন্ত্র-যুগের যত কিছু শক্তি তার বেশীর ভাগ নির্ভর করে এই লৌহের উপর। বড় বড় ইমারত, জাহাজ, ব্রীজ ইত্যাদি তৈরী করতে যে Girders, Tee iron, Angle iron, Channels প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন তা' তৈরী ক'রে দেয় steel দিয়ে বড় বড় সব লোহার কারখানা।

কিন্তু কারখানার ব্যাপার এখানে আমাদের বিষয়বস্তু নয়।

লোহার জিনিস আমাদের কুটীর-শিল্পের একটা প্রধান অবলম্বন। এই শিল্পে আমাদের উন্নতি দেখাবার যথেষ্ট স্থান আছে। আমাদের গ্রামের কামারেরা যে ছুরি, কাঁচি, দা প্রভৃতি তৈরী করে তাতে যথেষ্ট ত্রুটি থাকে। একমাত্র কাঞ্চননগরের ছুরি বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছে। দেশীয় কামারের তৈরী ক্ষুর এবং কাঁচিও বেশ সুন্দর হয়। এ বিষয়ে বাংলা গবর্ণমেণ্টের 'কাটলারি' পার্টির যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে।

ফ্যাক্টরী কলকারখানার প্রসার

দেশে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা বলবেন,—'কুটীর-শিল্প জাহান্নামে যাক্, আমাদের কলকারখানাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াক, তা'হলেই দেশের উন্নতি হবে। কলকারখানা না হলে কি টিপকলে সুতো কেটে আর রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বেলে দেশের উন্নতি হয়?' তাঁরা বলবেন,—'কলকারখানায় তৈরী জিনিস সস্তা হয় এবং কলকারখানার কাজ ক'রে অনেক দেশীয় লোকের ভরণপোষণও নির্ব্বাহ হয়।'

অবস্থা-বিশেষে কলকারখানার প্রয়োজন আছে তা' অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু প্রয়োজন আছে ব'লেই যদি আমরা কেবল কলকারখানার জিনিসই ব্যবহার করি তা'হলে আমাদের ঠকতে হবে—যেমন কলের তেল, কলের চাল এবং কলের আটায় হয়েছে। ঘানির তেল বা ঢেঁকি-ছাটা চাল আমরা চাইনে এবং চাইনে ব'লেই ওগুলো উঠে যাচ্ছে। ফলে কলওয়ালারা সুবিধা পেয়ে এবং অনেক সময় চাহিদা মিটাতে গিয়ে বা কুটীর-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নানারূপ অসদুপায় গ্রহণ করছে।

একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্।

কয়েকজন বড়লোক মিলে এখন যদি এমন একটা বিরাট কল স্থাপন করেন, যার মধ্যে দুধ ও চিনি ঢেলে দিলেই তার একদিক দিয়ে সন্দেশ, অন্যদিক দিয়ে রসগোল্লা এবং আর দিক দিয়ে পানতোয়া, রাবড়ি ইত্যাদি বেরিয়ে আসবে, তা'হলে আমাদের অনেকেরই তাতে আনন্দ হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে আমাদের দেশের লাভ ও লোকসানের কথা ভাবা যাক্।

লাভ—দু'আনা হবে রসগোল্লার সের এবং দশপয়সা হবে কাঁচাগোল্লার সের। আমাদের জলখাবারের খুব সুবিধা হবে—গুড়, মিছরী ছেড়ে দিয়ে আমরা কেবল রসগোল্লাই খাব। অনেক গরীব লোকেও তখন মুড়ী-মুড়কী ছেড়ে দিয়ে রসগোল্লা খেতে আরম্ভ করবে।

কলে কতকগুলো লোক কাজ করবে এবং তাতে তাদের অন্ন-সংস্থান হবে।

যাঁরা ঘর থেকে টাকা দিয়ে কারখানা খুলবেন সেই বড়লোকদের টাকা আরও বেড়ে যাবে।

লোকসান—কল কিনবার সময় বিদেশে এককালীন বেশ কিছু মোটা টাকা বেরিয়ে যাবে। দেশের ছোট-বড় সমস্ত খাবারের দোকান ক্রমে বন্ধ হবে। যারা ছানা বিক্রী ক'রে দু'পয়সা পায় তাদেরও অন্ন উঠে যাবে। কলে দশজন লোকের চাকরী হলেও—বাইরে শত শত লোক হবে বেকার!

যখন দেশের ময়রা এবং খাবারের দোকানগুলো লোপ পেয়ে যাবে অথচ আমাদের সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়ার লোভ আর অভ্যাস যাবে বেড়ে, তখন সুবিধা বুঝে কলওয়ালারা বেশী দামে খারাপ জিনিস চালাতে আরম্ভ করবে। আমাদেরও তখন বাধ্য হয়ে তাই কিনতে হবে।

বিদেশ থেকে কৃত্রিম দুধ ও ছানার আমদানী হবে—দেশের গোয়ালারা তখন গরুপোষা ছেড়ে দিয়ে চাকরীর খোঁজ করবে।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে—

কলকারখানায় দেশের আর্থিক উন্নতি হয়, কিন্তু সে অর্থ সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে না—কোনও বিশেষ স্থলে সেটা আবদ্ধ হয়ে থাকে; যেমন আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হয়েছে। কিন্তু কুটীর-শিল্পের দ্বারা যে অর্থাগম হয়, সমগ্র দেশবাসী তার অংশ পায়; যেমন হয়েছে জাপানে। জাপান তার কুটীর-শিল্পকে আজ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত ক'রে সমগ্র জগতের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে।

'কল' সম্বন্ধে আর একটা কথা বলবার আছে। কল রকমারির বা বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মিটাতে পারে না; তাঁত তা' পারে। এইজন্য কলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁত আজও সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে।

ধান থেকে চাল তৈরীর কল চলতি হওয়ায়—যাদের অর্থ আছে তাদের কেউ কেউ লাভবান হলেও অসংখ্য দরিদ্র অনাথা বিধবা তাদের জীবিকা হারিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলার বর্ত্তমান মোট ছাব্বিশটি চলতি কাপড়ের কলের মধ্যে মাত্র তের-চৌদ্দটি দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত এবং অন্যগুলো বিদেশী লোকেরা চালাচ্ছেন! ১৯২১ খৃষ্টাব্দের 'সেন্সাস্' অনুসারে সবগুলো কলকারখানা জড়িয়ে প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার মজুর কারিগরের মধ্যে কেবলমাত্র একাত্তর হাজার—অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও যথেষ্ট কম বাঙ্গালী!

বাংলার সামাজিক অনুষ্ঠান লোপ

বাংলাদেশ তার কুটীর-শিল্পে যে সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, ঐ সময়ের সামাজিক প্রথাগুলো অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়—তখনকার দিনের উৎসব এবং অনুষ্ঠানগুলো সবই দেশীয় শিল্পের পরিপোষক হয়ে গ'ড়ে উঠেছিল।

বাঙ্গালীর ঘরে তখন 'বারমাসে তের পার্ব্বণ' হ'ত; কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ছুঁতোর, মালাকার, তেলী, তাঁতি প্রভৃতি শ্রমিকও সে-সব অনুষ্ঠানের অঙ্গ-স্বরূপ ছিল। একটা বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসব কি পুকুর প্রতিষ্ঠার শাস্ত্র-সম্মত এবং লোকাচার-সম্মত বিধানগুলো দেখলেই তা' স্পষ্ট বোঝা যাবে।

কোনও কোনও অনুষ্ঠানে 'কুমারী সূতার'ও তখন অবশ্য আয়োজন ছিল। এই সূতো যে সব মেয়ের বিবাহ হয়নি তারাই কাটত এবং তখনকার দিনে এই সূতোর একটা বিশেষ গৌরবও ছিল। কিন্তু সেদিন আমাদের চ'লে গেছে। আধুনিক মতে—আল্পনা, 'শ্রী' তৈরী, লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় নিয়ে নববধূকে বরণ ক'রে ঘরে নেওয়া—অথবা ধোপা-নাপিত প্রভৃতি 'নবশাখ' নিয়ে এই সব কাজকর্ম্ম করা বর্ব্বরোচিত ব'লে গণ্য হয়! তাই বিবাহ-উপনয়নে এমন কি গৃহদেবতার পূজোতেও বিদেশী জিনিস এখন অবাধে এবং সগৌরবে ব্যবহৃত হচ্ছে—দুর্গোৎসবেও এখন মাকে বিদেশী সাজে ভূষিত করতে কারও বাধে না!

বড়লোকেরা এখন আর বিবাহ প্রভৃতি উৎসব পল্লীগ্রামে বড় একটা সম্পন্ন করেন না। কোনও আনন্দ-উৎসবে দরিদ্র পল্লীবাসীকে এখন তারা দু'মুষ্টি খেতে দিতে নারাজ! সেই পল্লী থেকে টাকা

তুলে সহরে গিয়ে তারা যাদের নিমন্ত্রণ করেন—তাঁরা বড়লোক বান্ধব এবং সাহেব! বাংলার কুটীর-শিল্প কার অনুকম্পায় গ'ড়ে উঠবে ?

কোনও দেশকে বাঁচিয়ে রাখে তার শিল্প—চাকরী নয়। কুটীর-শিল্প দেশকে স্বাধীনতা শিক্ষা দেয়—শিক্ষা দেয় নিজের যা দরকার, নিজে তা' তৈরী ক'রে নাও; পরের জিনিসের চাক্‌চিক্য দেখে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে থেকো না। গল্পের শৃগাল 'নাকের' বদলে 'নরুণ' পেয়ে আনন্দে নৃত্য করেছিল ব'লে আমরাও যেন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে—স্বদেশী শিল্প হারিয়ে পরের দেওয়া নরুণ পেয়ে নৃত্য না করি।